সার্বিয়া ও মন্টেনিগ্রো বুলগেরিয়ার সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং রাশিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এইভাবে রুশ তুরস্ক যুদ্ধের (১৮৭৬-৭৭) সূত্রপাত। প্লেভনা নামক স্থানে তুর্কী সেনাপতি ওসমান পাশা অসামান্য বীরত্বের সঙ্গে রুশ বাহিনীকে রুখে দেয়। শেষ পর্যন্ত প্লেভনার পতন হলে রুশ সৈন্য দ্রুত এগিয়ে গিয়ে এড্রিয়ানোপল দখল করে এবং কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। বাধ্য হয়ে সুলতান শান্তির প্রস্তাব দেন। **সানস্টিফানোর সন্ধিতে** রুশ তুরস্ক যুদ্ধের অবসান হয় (১৮৭৮)।

সানস্টিফানোর চুক্তিতে তুরস্ক রুমানিয়া, সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রোর স্বাধীনতা মেনে নেয়। উত্তরে রুমানিয়া, দক্ষিণে গ্রীস এবং পশ্চিমে সার্বিয়ার বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে বুলগেরিয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়। অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বুলগেরিয়া স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী হবে বলে স্থির হয়। রাশিয়া ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরে কারস্, বার্টুম প্রভৃতি স্থান দখল করেছিল। তাছাড়া সে ডব্রুজার বিনিময়ে রুমানিয়ার কাছ থেকে সেই সব অংশ ফিরে পাবার প্রস্তাব করেছিল, যা সে ১৮৫৬ সালে প্যারিসের চুক্তিতে হারিয়েছিল। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার ওপর রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার যৌথ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সানস্টিফানের চুক্তিতে বলকান অঞ্চলে রাশিয়ার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তুরস্কের পতন অনিবার্য মনে হয়। এই অবস্থায় ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি প্রতিবাদের ঝড় তোলে। তারা দাবি করে প্রাচ্য সমস্যা একটা আন্তর্জাতিক সমস্যা, আন্তর্জাতিক বৈঠকেই মতৈক্যের ভিত্তিতে ঐ সমস্যার সমাধান করতে হবে। শেষ পর্যন্ত বিসমার্কের নেতৃত্বে বার্লিন বৈঠকে ঐ সমস্যার পুনর্বিবেচনা শুরু হয়।

বার্লিন চুক্তিতে (১৮৭৮) সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো ও রুমানিয়াকে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র রূপে ঘোষণা করা হয়। তবে বসনিয়া ও হারজেগোভিনার শাসন অধিকার অস্ট্রিয়ার হাতে তুলে দেওয়া হয়। এবং সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রোর সংযোগস্থল নোভিবাজারের সঞ্জাকে সৈন্য মোতায়েনের অধিকারও অস্ট্রিয়া পায়। বৃহৎ বুলগেরিয়াকে তিন খণ্ডে বিভক্ত করে দক্ষিণের ম্যাসিডোনিয়া প্রদেশ তুরস্ককে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, ম্যাসিডনের উত্তরে পূর্ব রুমেলিয়াকে তুরস্কের অধীনে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল রূপে ঘোষণা করা হয় এবং বাকি অংশে স্বাধীন বুলগেরিয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়। রুমানিয়া রাশিয়াকে ডব্রুজার বিনিময়ে বেসারবিয়া ছেড়ে দেয়। তুরস্ক ভবিষ্যতে গ্রীসকে থেসালি এবং ফ্রান্সকে টিউনিসিয়া অধিকারের প্রতিশ্রুতি দেয়। ইংলন্ড সাইপ্রাস দ্বীপ লাভ করে। কনস্টান্টিনোপল ও আড্রিয়ানোপল সংলগ্ন ভূভাগ এবং ম্যাসিডোনিয়া ফিরে পাওয়ায় তুরস্ক নবজীবন লাভ করল।

বার্লিন চুক্তি বলকান জাতিগুলির কাউকে খুশি করতে পারেনি। অস্ট্রিয়া কর্তৃক বসনিয়া ও হারজেগোভিনা দখল এবং নোভিবাজারে সৈন্য মোতায়েন ঐক্যবদ্ধ বৃহৎ সার্বিয়া জাতিরাষ্ট্র গঠনের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। রুমানিয়া রাশিয়াকে অনুর্বর ডব্রুজার পরিবর্তে বেসারাবিয়া ছেড়ে দেওয়া মেনে নিতে পারেনি। সবচেয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছিল বুলগেরিয়া সানস্টিফানোর সন্ধিতে গঠিত বৃহৎ বুলগেরিয়াকে তিনভাগে বিভক্ত করে মাত্র একভাগকে স্বাধীনতা দেওয়ায়। গ্রীস, সার্বিয়া, বুলগেরিয়া সকলেই নিজ নিজ রাজ্য সংলগ্ন ম্যাসিডোনিয়ার অংশবিশেষ লাভ করতে চেয়েছিল। এখন ম্যাসিডোনিয়ায় তুরস্ক শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সকলেই বিক্ষুব্ধ হল। এইভাবে বার্লিন চুক্তি বলকান সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়।

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন বলেছেন যে বার্লিন কংগ্রেসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ফল হল এই যে তা প্রত্যেক দেশকে অসন্তুষ্ট রাখল এবং প্রত্যেক দেশই আগের থেকে অনেক বেশী উত্তেজনার মধ্যে রইল। ১৮৭৮ সালে ব্রিটেন ডার্ডানেলসে একটি নৌবহর প্রেরণ করেছিল একথা বোঝানোর জন্য যে তুরস্কে বা তার

চারপাশে তার স্বার্থ জড়িয়ে আছে। একথা বুঝেও তুরস্কের কিছু করার ছিল না। তুরস্ক সাম্রাজ্যের ভাঙ্গানের ফল হয়েছিল এই যে রাশিয়া আর ইংল্যান্ড তাদের সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা নিয়ে পূর্ব ইউরোপে এবং এশিয়াতে প্রায় মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল। অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী কখনোই চায়নি যে অটোম্যান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাক। কিন্তু অটোম্যান সাম্রাজ্যকে অটুট রাখার লক্ষ্যেও সে ব্যর্থ হল। ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী 'সম্মানের সঙ্গে শান্তি'র যে লক্ষ্যের কথা আগে ঘোষণা করেছিলেন তা পুরোপুরি রক্ষিত হয়নি। রাশিয়া বেসারবিয়া এবং অস্ট্রিয়া বসনিয়া ও হারজেগোভিনা লাভ করেও সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। বরং এইভাবে বলকান অঞ্চলকে ভাগ করার ফলে বৃহত্তর স্ল্যাভ রাষ্ট্রের কথা যারা ভাবত তাদের মনে আঘাত দেওয়া হয়েছিল। ডেভিড টমসন স্পষ্ট করেই বলেছেন যে ভবিষ্যতে বুলগেরিয়া বলকান অঞ্চলের ঝটিকা কেন্দ্র হয়ে রইল। সার্বিকভাবে বলকান জাতীয়তাবাদের সমস্ত বিপজ্জনক ধারার একটিও প্রশমিত হল না। এখন ইউরোপের শক্তিসাম্যের ধারক হয়ে দাঁড়াল ব্রিটেনও নয়, রাশিয়াও নয়—জার্মানি—অর্থাৎ এমন দেশ যার নিজের ভেতর অস্থিরতা কম ছিল না। এরপর এক প্রজন্মকাল ইউরোপে একটা আপাত শান্তির বাতাবরণ ছিল কিন্তু সে শান্তি ছিল অনিশ্চিত। মাঝে মাঝেই ইউরোপ যুদ্ধ ও সংকটের মধ্য দিয়ে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত যখন একটা বড় যুদ্ধের ভেতর দিয়ে গিয়ে প্রায় চল্লিশ বছর বাদে ইউরোপে আবার একটা কংগ্রেসের অধিবেশন বসল তখন সে অধিবেশন বার্লিনে বসেনি, বসেছিল প্যারিসে। ততদিনে বলকান জাতীয়তাবাদের সমস্যা তার ভিন্নতর সমাধান খুঁজে পেয়েছিল।

(ঙ) বলকান যুদ্ধের পটভূমিকা

বার্লিন চুক্তি (১৮১৭) বলকান সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হওয়ায় চুক্তির পরের দশকগুলিতে সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করে। সমস্যা জটিলতর হওয়ার প্রধান কারণ বলকান জাতিগুলির অতৃপ্ত জাতীয়তাবাদ ও ক্রমবর্ধমান জাতীয় আন্দোলন।

বুলগেরিয়া, সার্বিয়া ও গ্রীস সকলেরই দাবী ছিল ম্যাসিডনের ভিন্ন ভিন্ন অংশের ওপর। তুরস্কের কাছ থেকে ম্যাসিডন পুনরুদ্ধার করে জাতীয় স্বার্থ কিছুটা চরিতার্থ করা সম্ভব ছিল। ফলে তুরস্কের সঙ্গে আবার সংঘাতের সম্ভাবনা বেড়েই চলে।

রুশ-তুরস্ক যুদ্ধে রাশিয়ার ভূমিকায় বুলগেরিয়ায় রাশিয়ার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাশিয়ার রাণীর সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে ঘনিষ্ঠ আলেকজান্ডার ব্যাটেনবার্গ বুলগেরিয়ার রাজা নির্বাচিত হন। বুলগেরিয়া শাসনে সহায়তা করার জন্য বহু রাশিয়ান কর্মচারী নিযুক্ত হয়। কিন্তু আলেকজান্ডার নিজে ছিলেন রুশ বিদ্বেষী। রুশ কর্মচারীদের দুর্ব্যবহারেও বুলগেরিয়রা রুশ বিরোধী হয়ে ওঠে। ১৮৮৫ সালে পূর্ব রুমেলিয়া আলেকজান্ডারকে তাদের রাজা নির্বাচিত করে এবং পূর্ব-রুমেলিয়া ও বুলগেরিয়া ঐক্যবদ্ধ হয়। এই অবস্থায় রাশিয়া আলেকজান্ডারকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। কিছুদিন পর আলেকজান্ডার মুক্তি পেলেও এবং রাজপদে পুনর্বহাল হলেও পদত্যাগ করেন। তাঁর স্থলে জার্মানির স্যাকস্-কোবুর্গ-গোথা রাজপরিবারের সদস্য প্রিন্স ফার্ডিনান্ডকে রাজা নির্বাচিত করা হয়। ধীরে ধীরে বুলগেরিয়া রাশিয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন নীতি গ্রহণ করে।

বার্লিন চুক্তিতে সার্বিয়া সার্ব অধ্যুষিত ম্যাসিডনের রাজ্যাংশ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। অস্ট্রিয়া কর্তৃক বসনিয়া হারজেগোভিনা অধিগ্রহণ এবং সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রোর সংযোগস্থল নোভিবাজারে অস্ট্রিয়ার সৈন্য মোতায়েন বৃহৎ ঐক্যবদ্ধ সার্বরাষ্ট্র গঠনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। তাছাড়া আলবেনিয়া তুরস্কের অধীনে থাকায় সার্বিয়ার

ঐক্যবদ্ধ সার্বরাষ্ট্র গঠনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। ফলে সার্বিয়া অস্ট্রিয়া ও তুরস্কের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষ পোষণ করতে থাকে। বুলগেরিয়া ও রুমেলিয়া ঐক্যবদ্ধ হলে বুলগেরিয়ার প্রতিও সার্বিয়া ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে পড়ে।

গ্রীস অনেক আগে স্বাধীনতা পেলেও (১৮৩০) তার সীমানা সঙ্কুচিত করে রাখা হয়েছিল। গ্রীস মনে করত আয়োনীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং ক্রীট, থেসালি, এপিরাস ও ম্যাসিডোনিয়ার অংশবিশেষ গ্রীক সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল বলে তার প্রাপ্য। ১৮৮১ সালে তুরস্ক গ্রীসকে থেসালি ও এপিরাসের একাংশ প্রদান করে। কিন্তু গ্রীসের জাতীয় আকাঙ্ক্ষা এতে তৃপ্ত হয়নি।

রুমানিয়া রাশিয়ার কাছ থেক বেসারাবিয়া ফিরে পাবার জন্য এবং অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর সাম্রাজ্যভুক্ত ট্রানসিলভ্যানিয়া ও বুকোভিনা এবং বুলগেরিয়ার উত্তর অঞ্চলে অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে বৃহত্তর রুমানিয়া জাতি রাষ্ট্র গঠনের জন্য আন্দোলন শুরু করে। এইভাবে বিক্ষুব্ধ জাতীয়তাবাদ ১৯১২ সালের বলকান যুদ্ধের পটভূমি রচনা করেছিল।

বলকান সমস্যা জটিলতর হওয়ার আর একটি কারণ তুরস্কে তরুণ-তুর্কী আন্দোলন। তুরস্ক সুলতানের অত্যাচার থেকে রেহাই পাবার জন্য উদারনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী বহু তুর্কী দেশ ছেড়ে বিদেশে, বিশেষ করে ফ্রান্সে পালিয়ে গিয়েছিল। প্রবাসী তুর্কীরা বিদেশে বসেই বিপ্লবের ছক কষে। তারা দেশে ফিরে গিয়ে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ও সংবিধান রচনার জন্য সুলতানের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। সেনাবাহিনী তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। ফলে সুলতানের দাবী মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। তুরস্ক সাম্রাজ্যে পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীলরা আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে। এদিকে তুরস্কে বিশৃঙ্খলার সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী-বসনিয়া-হারজেগোভিনা পুরোপুরি দখল করে নেয়। বুলগেরিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ক্রীটের অধিবাসীরা গ্রীসের সঙ্গে তাদের সংযুক্তি ঘোষণা করে। ঘটনাগুলি সবই বার্লিন চুক্তির বিরুদ্ধে ছিল, কিন্তু ইউরোপের কোন বৃহৎশক্তিই হস্তক্ষেপ করতে এগিয়ে আসে নি। বরং জার্মানি ও ইটালি অস্ট্রিয়ার বসনিয়া হারজেগোভিনা দখলকে পূর্ণ সমর্থন জানায়। সার্বিয়া প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়, ভবিষ্যতে বৃহৎ সার্বিয়া গঠনের স্বপ্ন ভেঙে পড়ে। সব মিলিয়ে বলকান অঞ্চলে আবার সঙ্কট ঘনীভূত হয়ে আসে।

বলকান যুদ্ধের পটভূমি হিসাবে আর যে ঘটনার উল্লেখ করতে হয় সেটি হচ্ছে বৃহৎ শক্তিগুলির পরিবর্তিত নীতি। বার্লিন চুক্তির পর বিশেষভাবে বুলগেরিয়ায় তার প্রভাবের অবসান হলে রাশিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের পরিবর্তে এশিয়ায় সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করে। জার্মানি তার উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার বসবাসের জন্য এবং পুঁজি বিনিয়োগের জন্য 'পুবের দিকে এগিয়ে চলো' (Drang nach Osten) নীতি নিয়ে দ্রুত তুরস্ক সাম্রাজ্যে প্রভাব বিস্তার করে। ১৯০৮ সালে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম নিজে কন্সটান্টিনোপল পরিভ্রমণ করে সুলতানের সঙ্গে মৈত্রী দৃঢ় করেন। এই অবস্থায় ইংলন্ডের রাশিয়া ভীতি দূর হয় এবং রাশিয়ার সঙ্গে সব বিরোধ মিটিয়ে ফেলে মিত্রতা স্থাপন করে (১৯০৭)। একই সঙ্গে ইংলন্ড বুলগেরিয়ার জাতীয় আন্দোলনের প্রতিও সহানুভূতিশীল হয়।

(চ) প্রথম বলকান যুদ্ধ

তুরস্কে তরুণ তুর্কী আন্দোলন ব্যর্থ হলে (১৯০৮) এবং তুরস্কের সরকার প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে চলে গেলে অমুসলমান প্রজাদের ওপর আগের মতই উৎপীড়ন শুরু হল। এই অবস্থায় সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো, বুলগেরিয়া ও গ্রীস একতাবদ্ধ হয়ে বলকান লীগ গঠন করে। ম্যাসিডোনিয়ায় তুরস্কের কঠোর নীতির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বলকান লীগের সদস্যগণ তুরস্কের বিরুদ্ধে সামরিকভাবে অগ্রসর হয়ে প্রথম বলকান যুদ্ধের সূচনা করে (১৯১২)। যুদ্ধে

তুরস্ক প্রতিটি বলকান রাষ্ট্রের হাতে পরাজিত হয়। মন্টিনিগ্রো যুদ্ধ শুরু করে। গ্রীস ম্যাসিডোনিয়ায় প্রবেশ করে সালোনিকা (Salonica) দখল করে। সার্বিয়া তুরস্ককে পরাজিত করে আলবেনিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হয়। সবচেয়ে চমকপ্রদ সাফল্য পায় বুলগেরিয়া। সে তুরস্ককে পরাজিত করে কন্সটান্টিনোপলে-এর কাছাকাছি পৌঁছে যায়। তুরস্কের যুদ্ধের থেকে অব্যাহতি ও শান্তি কামনা করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। অবশেষে লন্ডন চুক্তি দ্বারা প্রথম বলকান যুদ্ধের অবসান হয় (১৯১৩)। এই চুক্তিতে তুরস্ক ইউরোপ থেকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হয়। কেবলমাত্র থ্রেস (Thrace)-এর কিছু অংশে তার অস্তিত্ব বজায় থাকে। গ্রীস ক্রীট লাভ করে। আলবেনিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়।

(ছ) দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ

প্রথম বলকান যুদ্ধে বলকান লীগের সদস্যরা তাদের সাধারণ শত্রু তুরস্কের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। তুরস্কের সহজ পরাজয় তাদের ঐক্যকে বিনষ্ট করে এবং তারা বিজিত রাজ্যের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে বিবাদ শুরু করে।

চারিদিকে স্থলভাগ বেষ্টিত সার্বিয়া চেয়েছিল আলবেনিয়ার মধ্য দিয়ে এড্রিয়াটিক উপসাগরে প্রবেশ করতে। কিন্তু আলবেনিয়াকে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করায় সার্বিয়া হতাশ হয়। সে এখন ম্যাসিডোনিয়ায় আরও বেশি এলাকা দাবি করে। তুরস্কের বিরুদ্ধে সহজ জয়ে বুলগেরিয়া তার ক্ষমতা সম্পর্কে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল। সে সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো ও গ্রীসের দাবীকে অগ্রাহ্য করে সমগ্র ম্যাসিডোনিয়া গ্রাস করে এবং সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এইভাবে দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ শুরু হয়। রুমানিয়া, গ্রীস ও মন্টিনিগ্রো বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়। সুযোগ বুঝে তুরস্ক হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের আশায় বুলগেরিয়াকে আক্রমণ করে। এইভাবে যুগপৎ পাঁচটি রাজ্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বুলগেরিয়া সহজেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। অবশেষে রুমানিয়ার চেষ্টায় বুখারেস্টের সন্ধির দ্বারা (১৯১৩) দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। বুখারেস্টের সন্ধিতে ম্যাসিডোনিয়ার বৃহত্তর অংশ বণ্টিত হল গ্রীস ও সার্বিয়ার মধ্যে। তাছাড়া গ্রীস পায় ঈজিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি দ্বীপ, রুমানিয়া পায় দক্ষিণ ডব্রুজার অংশবিশেষ। নোভিবাজার সার্বিয়া ও মন্টেনিগ্রোর মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়।

বুখারেস্টের সন্ধি বলকান সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে পারেনি। সার্বিয়া ও বুলগেরিয়ার দূরত্ব বেড়ে চলে। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও সার্বিয়ার সংঘাত ইউরোপে সবচেয়ে বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানাতে জার্মানি এগিয়ে আসে, অন্যদিকে সার্বিয়াকে উস্কানি দেয় রাশিয়া। পরাজিত, অপমানিত ও ক্ষুব্ধ বুলগেরিয়া প্রতিশোধের বাসনায় ধীরে ধীরে জার্মানি ও তুরস্কের ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। এইভাবে ইউরোপে বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বলকান জাতির পারস্পরিক বিরোধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করে।

৪(ক).৪ বলকান জাতীয় জাগরণ ও জাতিরাষ্ট্র গঠন

অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্যের ভাঙ্গান ও সে ভাঙ্গান নিয়ে ইউরোপীয় শক্তিগুলির আন্তর্জাতিক কূটনীতি ও চক্রান্ত বলকান জাতীয়তাবাদের অন্তরালে প্ররোচনা ও প্রেরণা দুই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তুরস্ক সমেত সমস্ত বলকান রাজ্যগুলির নিজস্ব গঠন ও বিকাশ। উনিশ শতকে তুরস্ক রাজনৈতিক দিক থেকে দুর্বল হলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে ততটা দুর্বল ছিল না। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ কৃষি, বাণিজ্য এবং শিল্পেও

এগিয়ে চলেছিল। আবার বলকান জাতিরাষ্ট্র গঠনের পিছনেও একটা বড় প্রেরণা ছিল সমৃদ্ধতর ভবিষ্যৎ রচনার আকাঙ্ক্ষা কিভাবে চরিতার্থ হয়েছিল তা বোঝানোর জন্য নীচে বলকান অঞ্চলে জাতিরাষ্ট্র গঠনের ইতিহাস পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করা হল।

(ক) সার্বিয়া

বলকান জাতিগুলির মধ্যে সার্বিয়াই তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহী হয়। কিন্তু এই বিদ্রোহের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। শূকর পালক কারাজর্জের সফল আন্দোলন (১৮০৪ থেকে ১৮১৩) প্রধানত অত্যাচারী স্থানীয় জানিসারির (তুরস্কের বাছাই সৈন্য) বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। ১৮১৩ সালে তুরস্ক সার্বিয়া পুনর্দখল করে। কারাজর্জ হাঙ্গেরীতে পালিয়ে যান। সেখানে সহকর্মী মিলোশ ওব্রোনেভিকের ষড়যন্ত্রে কারাজর্জ নিহত হন। ওব্রোনোভিক সার্বিয়ায় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। রাশিয়ার চাপে সুলতান ওব্রোনোভিক সার্বিয়ার পাশা বলে মেনে নেয়। সার্বিয়া স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পায়।

সংস্কৃতির পুনর্জাগরণের মধ্য দিয়ে সার্বিয়ার জাতীয় জাগরণ শুরু হয় ১৮২০ থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে। সার্বিয়ানরা অতীত গৌরবের দিকে দৃষ্টি ফেরায়। প্রাচীন ইতিহাস, লোকগাথা সাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কারাদজিক (Vuk Karadzic) নামক একজন লেখক সার্বিয়ার ভাষা ও ব্যাকরণের সংস্কার করেন এবং ঐ ভাষায় অভিধান রচনা করেন। সার্বিয়ানরা সার্ব অধ্যুষিত বসনিয়া, হারজেগোভিনা, মন্টিনিগ্রো ও সার্বিয়াকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ জাতিরাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখে।

কৃষিকাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সার্বিয়া ছিল অনগ্রসর। সমুদ্রে প্রবেশপথ না থাকায় বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। যাতায়াতের জন্য অস্ট্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ডানিয়ুব নদীর ওপর তাকে নির্ভর করতে হত। ১৮৭৭-৭৮ সালে রুশ-তুরস্ক যুদ্ধের পর সার্বিয়া স্বাধীনতা পেলেও তাকে পার্শ্ববর্তী সার্ব রাজ্যগুলির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া বা সমুদ্র উপকূলে পৌঁছানোর সুযোগ দেওয়া হয়নি। ফলে উনিশ শতকের শেষে সার্ব জাতীয়তাবাদ বলকান জাতিগুলির মধ্যে প্রবল আকার ধারণ করে। তাদের অসন্তোষ এবং অস্ট্রিয়ার সঙ্গে বিরোধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বড় কারণ।

(খ) গ্রীস

সার্বিয়া প্রথম স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পেলেও গ্রীসই প্রথম স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। গ্রীসে জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত হয় আঠারো শতকের শেষে ভাষা ও সাহিত্যের পুনর্জাগরণের মধ্য দিয়ে।

গ্রীসের প্রাচীন ধ্রুপদী ভাষা তখন কেবলমাত্র যাজক ও বিদগ্ধ পণ্ডিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রাচীন ভাষার বিকৃতরূপ ও নানা ভাষা থেকে গৃহীত শব্দ যোগে সাধারণের ভাষা তৈরি হয়েছিল। আঠারো শতকের শেষে বিখ্যাত সাহিত্যিক আডামানটিওস কোরেস (Adamantios Koraes) ও রীগাস ফেরাইওস (Rhigas Pheraios) প্রাচীন গ্রীক ভাষার সঙ্গে আধুনিক ভাষার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে গ্রীক ভাষার পুনর্জাগরণ ঘটান। ভাষা সংস্কারের ফলে গ্রীকরা তাদের ধ্রুপদী সাহিত্যের গ্রন্থরাজি পাঠ করতে সক্ষম হয়। প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনার মাধ্যমে গ্রীকদের মধ্যে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে। প্রাচীন সংস্কৃতি সম্পর্কে তারা এমনি গর্ব বোধ করতে থাকে যে এখন থেকে তারা নিজেদের আর রোমান (Romans) না বলে হেলেনীজ (Hellenes) বলা শুরু করে।

সংস্কৃতির পুনর্জাগরণের সঙ্গে যুক্ত হয় ফরাসী বিপ্লবের জাতীয়তাবাদী প্রভাব। কোরেস ও রীগাস ফরাসী জাতীয়তাবাদ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। রীগাস স্পেন জার্মানি বা ইটালির গুপ্ত সমিতির অনুকরণে অনেক গুপ্ত সমিতি গড়ে তোলেন। এদের উদ্দেশ্য ছিল তুরস্কের বিরুদ্ধে গ্রীকদের জাতীয় বিদ্বেষ সৃষ্টি করা। ১৭৯৮ সালে রীগাস তুর্কী শাসকদের হাতে শহীদ হন।

গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করে ফিলিকে হেটাইরিয়া (Philike Hetairia— অর্থ Association of Friends) নামে অন্য একটি গুপ্ত সমিতি। আলেকজান্ডার ইপ্সিলান্টির নেতৃত্বে ক্রিমিয়া দ্বীপে গ্রীক বণিকদের দ্বারা ফিলিকে হেটাইরিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮১৪)। ১৮১৪-২০ সালের মধ্যে ফিলিকে দ্রুত অটোমান সাম্রাজ্যের সর্বত্র শিক্ষিত ও পদস্থ গ্রীকদের মধ্যে বিস্তারলাভ করে। ১৮২০ সালে এর সদস্য সংখ্যা ছিল আশি হাজার। গ্রীকদের সঙ্গে ধর্মীয় মিল থাকায় রুশরা বিপুলভাবে হেটাইরিয়া ফিলিকেকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। চারিদিক থেকে অর্থ আসে এবং ঐ অর্থ দিয়ে অস্ত্র কিনে গোপনে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি চলে।

গ্রীক স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয় ১৮২১ সালে। এই স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম ছয় বছরে গ্রীকরা এককভাবে সংগ্রাম করে। উভয়পক্ষই এই পর্যায়ে নৃশংস বর্বরতার পরিচয় দেয়। মিশরের শাসনকর্তা মেহমেত আলি তুরস্কের পক্ষে হস্তক্ষেপ করলে স্বাধীনতা সংগ্রামের পট পরিবর্তন হয়। মিশরীয় সেনারা মোরিয়া দ্বীপের মিসলঙ্ঘির (Missolonglu) সব গ্রীকদের হত্যা করলে ইউরোপে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান গ্রীসের প্রতি ইউরোপীয়রা গভীর সহানুভূতি দেখাতে এগিয়ে আসে। ইতিমধ্যেই ফ্রান্স, ইংলন্ড, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশে সংগ্রামী গ্রীকদের সমর্থনে সমিতি (Philhellenic Society) গঠিত হয়েছিল। নানা দেশ থেকে অর্থ, অস্ত্র এবং যুদ্ধ করার জন্য স্বেচ্ছাসেবী আসতে শুরু করে। ইংরেজ কবি বাইরন নিজে যুদ্ধে যোগ দিতে এসে প্রাণত্যাগ করেন। ফ্রান্সে লাফায়েৎ, স্যাটোব্রিয়াঁ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ গ্রীকদের সমর্থনে অর্থ, অস্ত্র সরবরাহ করে পাঠাতে থাকেন। ইংলন্ডের ব্যাঙ্ক মালিকরা গ্রীক বণিকদের অনেক অর্থ ধার দিয়েছিল। ইংলন্ডের স্বার্থ ছিল গ্রীকদের রক্ষা করা। এই অবস্থায় ইংলন্ড, ফ্রান্স রাশিয়ার মধ্যে লন্ডন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং তুরস্ককে গ্রীসের স্বাধীনতা মেনে নিতে বলা হয়। তুরস্ক ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে ফ্রান্স ও ইংলন্ডের নৌবহর তুর্কী-মিশরীয় নৌবহরকে নাভারিনোর (Navarino) নৌযুদ্ধে ধ্বংস করে। এই যুদ্ধ ফ্রান্স ও ইংলন্ডের অনভিপ্রেত ছিল, তারা তুরস্কের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে এবং থমকে যায়। রাশিয়া এককভাবে হস্তক্ষেপ করে। রাশিয়া যুদ্ধে ক্রমাগত জয়লাভ করতে থাকে ও অ্যাড্রিয়ানোপল পর্যন্ত এগিয়ে যায়। তুরস্ক বাধ্য হয়ে শান্তির প্রস্তাব দেয়। লন্ডন চুক্তিতে (১৮২৯) ইংলন্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া ও তুরস্ক মিলিতভাবে গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয় ও গ্রীসের সঙ্কুচিত সীমানা নির্ধারিত করে দেয়। গ্রীকরা স্বভাবতই তাদের সঙ্কুচিত সীমানায় সন্তুষ্ট হতে পারে নি।

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির ব্যাভেরিয়া রাজকুমার গ্রীসের রাজা মনোনীত হন। তিনি ১৮৩৩ থেকে ১৮৬২ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে গ্রীসকে নিরপেক্ষ রাখার জন্য তিনি অপ্রিয় হয়ে ওঠেন এবং প্রজা বিদ্রোহে সিংহাসন হারান। তাঁর স্থলে নতুন রাজা নির্বাচিত হন একজন দিনেমার (Danish) রাজকুমার। তিনি সংবিধানের শাসন প্রবর্তন করেন। ইংলন্ড ১৮৬৪ সালে গ্রীসকে আইওনীয় দ্বীপপুঞ্জ (Ionian Islands) ফিরিয়ে দেয়। ১৮১৫ সাল থেকে ঐ দ্বীপপুঞ্জ ইংলন্ডের অধীনে ছিল। বার্লিন চুক্তিতে (১৮৭৮) গ্রীসের সীমানা পুনর্নির্ধারণের জন্য তুরস্কের ওপর চাপ দেওয়া হয়। তুরস্ক অনিচ্ছা সত্ত্বে ১৮৮১ সালে গ্রীকে থেসালি ফিরিয়ে

দেয়। তরুণ তুর্কী বিদ্রোহের বিশৃঙ্খলার সুযোগে গ্রীস ক্রীট জয় করে (১৯০৮)। গ্রীসের উত্তরে ম্যাসিডোনিয়ায় বহু গ্রীক বাস করত। ঐ অংশের ওপর গ্রীসের দাবী ছিল। প্রথম বলকান যুদ্ধে (১৯১২) গ্রীসের দাবী না মানা হলে দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধে (১৯১৩) গ্রীস বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং যুদ্ধশেষে বুখারেস্টের সন্ধিতে (১৯১৩) ম্যাসিডনের অংশবিশেষ এবং ঈজিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি দ্বীপ লাভ করে। এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে গ্রীসে প্রায় সত্তর লক্ষ অধিবাসীর সংযোজন হয়।

(গ) রুমানিয়া

ডানিয়ুব অঞ্চলের দুটি প্রদেশ মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া (এদের Danubian Principalities বলা হত) নিয়ে গঠিত রুমানিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য। প্রদেশ দুটির ওপর বরাবর অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার লোলুপ দৃষ্টি ছিল। রাশিয়া সুযোগ পেলেই প্রদেশ দুটি—আংশিক বা সম্পূর্ণ দখল করে নিত। পরে ইউরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রের চাপে ছেড়ে দিতে বাধ্য হত। এখানে তুরস্কের নিয়ন্ত্রণ ছিল সামান্যই।

এখানেও সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে রুমানিয়ার জাতীয় ইতিহাস রচিত হয়। রোমান্টিক সাহিত্য রচনা করেন গ্রিগোর আলেকজান্দ্রেস্কু (Gregore Alexandrescu)। রুমানিয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ শুরু হয়েছিল সতেরো শতকে। উনিশ শতকে তা সম্পূর্ণ হয়। এখানকার অধিবাসীরা ছিল রোমান ক্যাথলিক, গ্রীক ক্যাথলিক অথবা ইহুদী ধর্মাবলম্বী। রাশিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে রুমানিয়া জাতীয় আন্দোলনে সাহায্য করত। কিন্তু অচিরেই এই আন্দোলন রাশিয়ার বিরুদ্ধে চলে যায়। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন রুমানিয় জাতীয় আন্দোলনের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা রুমানিয়ার স্বাধীনতার পথে বড় বাধা ছিল। গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় রাশিয়া প্রদেশ দুটি দখল করে নেয়। কিন্তু পরে বৃহৎ রাষ্ট্রের চাপে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ডানিয়ুবের মোহনায় বেসারাবিয়ার ওপর রাশিয়ার লোভ ছিল। প্যারিসের সন্ধিতে (১৮৫৬) মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া প্রদেশ দুটি তুরস্কের সাম্রাজ্যের অধীনে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পায়। ১৮৫৯ সালে দুটি প্রদেশের অধিবাসীই নির্বাচনের মাধ্যমে প্রদেশ দুটির সংযুক্তি ঘটিয়ে অখণ্ড রুমানিয়া রাজ্য গঠন করে। আলেকজান্ডার কুজা (Alexander Cuza) নামে একজন সেনানায়ককে সম্মিলিত রাজ্যের রাজা নির্বাচিত করা হয়। বুখারেস্টে রাজধানী স্থাপিত হয়। ১৮৬৬ সালে গণ আন্দোলনের ফলে কুজা পদচ্যুত হন। তাঁর স্থলে রাজা হিসাবে নির্বাচিত হন জার্মানির হোহেনজোলার্ন রাজবংশের ক্যারল নামে জনৈক ব্যক্তি। বার্লিন চুক্তিতে (১৮৭৮) রুমানিয়াকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। কিন্তু রাশিয়া উর্বর বেসারাবিয়া দখল করে এবং বিনিময়ে রুমানিয়াকে অনুর্বক ডব্রুজা অঞ্চল ছেড়ে দেয়। রুমানিয়া দুই বলকান যুদ্ধে যোগদান করে ডব্রুজা অঞ্চলের সীমানা সামান্য বাড়াতে পেরেছিল।

রাজা ক্যারল চার্লস উপাধি নিয়ে রুমানিয়ায় সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের প্রবর্তন করেন। তিনি প্রাশিয়ার অনুকরণে এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করেছিলেন। রুমানিয়ায় রেলপথ স্থাপিত হয়, রাস্তাঘাটের উন্নতি করা হয় এবং ভূমি সংস্কারে হাত দেওয়া হয়। অন্য বলকান রাজ্যগুলির তুলনায় রুমানিয়া ব্যবসা বাণিজ্যে দ্রুত উন্নতি করে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় (প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে পনেরো লক্ষ) জমির ওপর চাপ পড়তে থাকে। ফলে প্রজারা মাঝে মাঝেই বিদ্রোহী হয়ে উঠত। ১৯০৭ সালে এই রকম একটি বিদ্রোহ দমন করতে লক্ষাধিক সৈন্য নিয়োগ করতে হয়েছিল। বিদ্রোহের পর কৃষকদের দুর্দশা লাঘব করার জন্য নানা পদক্ষেপও নেওয়া হয়।

(ঘ) বুলগেরিয়া

বলকান জাতিগুলির মধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ প্রথম বুলগেরিয়াতে হলেও বুলগেরিয়া সবশেষে স্বাধীনতা লাভ করে। জাতীয় জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় যাজক সম্প্রদায়। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে পাদ্রী ফাদার পেইজি (Father Paisy) বুলগেরিয়ার ইতিহাস (Slavo Bulgarian History) রচনা করেন। এই বই-এ বুলগেরিয়দের বিদেশী দ্রব্য ত্যাগ করতে বলা হয়েছিল। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে বুলগেরিয়ায় প্রথম আধুনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কয়েক দশকের মধ্যে সারাদেশে বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় দু হাজার। বুলগেরিয় ভাষায় অভিধান প্রকাশ করেন গেরভ (N. Gerov)। প্রাচীন ইতিহাস, কবিতা, লোকগাথার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ প্রচারিত হতে থাকে। এ ব্যাপারে বিদ্যালয়গুলি সক্রিয় ভূমিকা নেয়। ১৮৭০ সালে বুলগেরিয়ার গ্রীক চার্চ ইস্তানবুলের গ্রীক চার্চ থেকে পৃথক হয়ে যায়। বুলগেরিয় চার্চের পৃথক অস্তিত্ব গ্রীসের গোঁড়া খ্রিস্টানদের ক্ষুব্ধ করে।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বুলগেরিয়দের লক্ষ্য ছিল ওব্রেনোভিকের নেতৃত্বে সার্বিয়া যেমন স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পেয়েছিল ঐরূপ অধিকার অর্জন করা। তারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার কথা ভাবেনি। স্বাধীনতার দাবী দানা বাঁধে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর। রাশিয়া এই আন্দোলনকে সমর্থন জানায়। তুরস্ক ভেবেছিল বুলগেরিয়ার পৃথক চার্চ বলকান অঞ্চলে বুলগেরিয় ও অন্য জাতিগুলির মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করবে। তাই পরোক্ষে তুরস্ক ও বুলগেরিয় স্বাধীনতা যুদ্ধে ইন্ধন যোগায়।

১৮৭৬-১৮৭৭ সালে বুলগেরিয় হত্যাকাণ্ডের সময় রাশিয়া ছাড়া অন্য কোন বৃহৎ রাষ্ট্র বুলগেরিয়ার সাহায্যে এগিয়ে আসে নি। রাশিয়াই এককভাবে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং তুরস্ককে পরাজিত করে সানস্টিফানোর সন্ধিতে স্বাধীন বৃহৎ বুলগেরিয়া গঠন করে। বার্লিন চুক্তিতে (১৮৭৮) বুলগেরিয়াকে তিনভাগে বিভক্ত করে মাত্র এক ভাগকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়। বাকী দুভাগের মধ্যে পূর্ব রুমেলিয়া স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পায় আর ম্যাসিডন তুরস্ককে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এই কৃত্রিম বিভাগ বুলগেরিয়া নেনে নিতে পারেনি।

রুশ-তুরস্ক যুদ্ধের (১৮৭৭-৭৮) পর থেকেই বুলগেরিয়ায় রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। রুশ কর্মচারীরা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়ে বুলগেরিয়া শাসনে সাহায্য করে। রুশ-সাম্রাজ্ঞীর আত্মীয় জার্মানির ব্যাটেনবার্গের রাজকুমার আলেকজান্ডার বুলগেরিয়ার রাজা নির্বাচিত হন। কিন্তু আলেকজান্ডার ছিলেন রুশ বিরোধী। রুশ কর্মচারীদের দুর্ব্যবহারেও বুলগেরিয়দের রুশ বিরোধী করে তোলে। ১৮৮৫ সালে পূর্ব রুমেলিয়া বুলগেরিয়ার সঙ্গে সংযুক্তির দাবী করলে আলেকজান্ডার সেই দাবী মেনে নেন। পূর্ব রুমেলিয়া ও বুলগেরিয়া ঐক্যবদ্ধ হয়। এদিকে রুশ বিরোধী নীতির জন্য আলেকজান্ডার বুলগেরিয়ার সিংহাসন হারান। তাঁর স্থলে নির্বাচিত হন স্যাকস-কোবুর্গ-গোথার রাজকুমার ফার্ডিনান্ড। বুলগেরিয়া বলকানলীগ গঠন করে প্রথম বলকান যুদ্ধে তুরস্ককে সম্পূর্ণ পরাজিত করে এবং বলকান অঞ্চলকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে। কিন্তু যুদ্ধের পর অধিকৃত স্থানের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে বলকান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধে বুলগেরিয়া অন্য বলকান রাষ্ট্রগুলির দ্বারা পরাজিত হলে সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো, গ্রীস ও বুলগেরিয়ার মধ্যে ম্যাসিডন বিভাজিত হয়। পরাজিত ক্ষুব্ধ বুলগেরিয়া প্রতিশোধের জন্য ধীরে ধীরে তুরস্ক, জার্মানি ও অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর সঙ্গে মিত্রতার নীতি গ্রহণ করে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির পক্ষে যোগ দেয়।

৪(ক).৫ সারাংশ

ফরাসী বিপ্লবের পরোক্ষ ফল হিসাবে উনিশ শতকে পৃথক ভাষা ও জাতির ভিত্তিতে পৃথক জাতি-রাষ্ট্র গঠনের দাবী ওঠে। বলকান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও এই ভাবধারায় প্রভাবিত হয়। তবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আগে সব দেশেই সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ ঘটে। ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, লোকগাথা প্রভৃতির আলোচনার মাধ্যমে লোকে অতীতের দিকে মন ফেরায়। জাতীয় গৌরব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই পৃথক রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। জাতিরাষ্ট্র গঠনের পিছনে আর একটি তাগিদ ছিল— অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা। বলকান অঞ্চলের জাতিগুলি মনে করত পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হলে তারা সমৃদ্ধতর ভবিষ্যৎ রচনা করতে পারবে। ইউরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি নিজেদের স্বার্থে বলকান জাতীয়তাবাদকে কখনও ইন্ধন যুগিয়েছে, কখনও প্রতিরোধ করেছে। ইংল্যান্ডের রুশভীতি ও অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীয় তুরস্ক প্রীতি বলকান সমস্যাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। অটোমান সাম্রাজ্যের ক্রম ক্ষয়িষ্ণুতা যেমন বলকান রাজ্যগুলির সামনে অনেক সুযোগ এনে দিয়েছিল সেইরকম বলকান রাজ্যগুলির নিজেদের ঈর্ষা ও পারস্পরিক দ্বন্দ্বও তাদের নানাভাবে দুর্বল করে রেখেছিল। স্বাধীনতা অর্জনের সময় বলকান রাষ্ট্রগুলি সঙ্কুচিত সীমানা পায়। পরে বিভিন্ন সঙ্কটে তাদের ভূমিকার ওপর নির্ভর করে সীমানা হয় পুরস্কারস্বরূপ বাড়ানো হয়েছে নতুবা শাস্তিস্বরূপ কমানো হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্‌কালে কোন বলকান রাষ্ট্রই সন্তুষ্ট ছিল না। বিশ্বযুদ্ধের পরে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা হয়।

৪(ক).৬ অনুশীলনী

১। বলকান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পটভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

২। গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রামের বর্ণনা দিন।

৩। রুশ-তুরস্ক যুদ্ধ (১৮৭৭-৭৮) কেন ঘটেছিল?

৪। বার্লিন চুক্তি (১৮৭৮) কি বলকান জাতিগুলির আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে পেরেছিল?

৫। প্রথম বলকান যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করুন।

৬। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে বুলগেরিয়ার সঙ্গে অন্যান্য বলকান জাতির বিরোধের কারণ কি?

৭। বলকান জাতীয় জাগরণে রাশিয়ার ভূমিকা আলোচনা করুন।

৮। বৃহৎ সার্ব রাষ্ট্রগঠনে অস্ট্রিয়া কিভাবে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল?

৯। রুমানিয়া রাষ্ট্রটি কি ভাবে গঠিত হয়েছিল?

১০। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বুলগেরিয়া কেন অক্ষশক্তির পক্ষে যোগ দেয়?

৪(ক).৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। J.A.R. Marriot—*The Eastern Question* (1930)

২। Seton Watson—*The Rise of Nationality in the Balkans.*

৩। David Thomson—*Europe Since Napoleon* (1965).

৪। C. D. Hazen—*Europe Since 1815* (1923).

৫। W. Miller—*The Ottoman Empire And Its Successors* (1936).

৬। A.J.P.Taylor—*The Struggle For mastery in Europe 1848-1918* (1954).

৭। E. Lipson— *Europe in the 19th & 20th Century.*

৮। সমর কুমার মল্লিক—*নবরূপে ইউরোপ, ১৮৪৮-১৯১৯* (২০০২)

৯। প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী—*ইউরোপের ইতিহাস* (১৯৮৩)।

একক ৪(খ) ❑ নতুন কূটনীতি

গঠন

৪(খ).০ উদ্দেশ্য

৪(খ).১ প্রস্তাবনা

৪(খ).২ প্রারম্ভিক কথা

৪(খ).৩ উনিশ শতকে কূটনীতির বৈশিষ্ট্য

৪(খ).৪ উনিশ শতকের কূটনীতিতে গোপনীয়তার সবিশেষ অভ্যুদয়

৪(খ).৫ নয়া কূটনীতির জন্ম

৪(খ).৬ খোলা কূটনীতি নিয়ে মর্গেনথোর মত

৪(খ).৭ নয়া কূটনীতি কি বিদ্রোহ?

৪(খ).৮ পুরানো কূটনীতি বনাম নয়া কূটনীতি : বৈশিষ্ট্য ভিত্তিক পর্যালোচনা

৪(খ).৯ নয়া কূটনীতির মার্ক্সবাদী সমালোচনা

৪(খ).১০ সারাংশ

৪(খ).১১ প্রশ্নাবলী

৪(খ).১২ গ্রন্থপঞ্জী

৪(খ).০ উদ্দেশ্য

১৮৭০-এর দশক থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর ১৯১৮ সালে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনের (Woodrow Wilson) চৌদ্দ দফা শর্ত ঘোষণার সময় পর্যন্ত ইউরোপীয় মহাদেশে কূটনীতির রূপ বদলাচ্ছিল। এইরূপ বদলানোটা ছিল স্বাভাবিক। বিগত পঞ্চাশ বছরে মহাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির বিপুল পরিবর্তন হয়েছে। জার্মানি ও ইটালি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। রাজতান্ত্রিক রক্ষণশীলতা পরাভূত হয়েছে ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের দ্বারা। ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইংল্যান্ডে ও ফ্রান্সে শিল্পবিপ্লব এসেছে। ইংল্যান্ডে বিশেষ করে এক বিরাট শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম হয়েছে। রাশিয়াতে সার্ফরা মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু সমাজ শক্তিশালী হয়নি, রাষ্ট্র সংহত হতে পারেনি। নিহিলিজম্ (Nihilism) নামে এক সংহারের দর্শন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষার উপায়হীন জারতন্ত্র ক্রমশ বিপর্যয়ের মধ্যে তলিয়ে যেতে শুরু করেছিল। এদিকে ইউরোপে অটোম্যান তুর্কী সাম্রাজ্য দুর্বল হওয়ার ফলে বলকান অঞ্চলের দেশগুলির মধ্যে জাতীয়তাবাদ বাড়ছিল। অখিল স্ল্যাভ (Slav) চেতনা (Pan-Salvism) ধীরে ধীরে ঘনীভূত হতে শুরু করেছিল। যেহেতু অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর সাম্রাজ্য ছিল বহুজাতিক সাম্রাজ্য আর সেখানে যথেষ্ট পরিমাণ স্ল্যাভরা থাকত সেহেতু অখিল স্ল্যাভবাদ (Pan-Slavism) অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের পক্ষে ছিল বিপজ্জনক। এই সমস্ত কিছু নিয়ে পরিস্থিতি

জটিল হয়ে উঠছিল। এক দেশের সঙ্গে অনেক দেশের সম্পর্কের মধ্যে নানা টানাপোড়েন শুরু হয়েছিল। ইউরোপীয় দেশগুলির গার্হস্থ্য রাজনীতি যেমন বদলাচ্ছিল সেইরকমভাবে বদলাচ্ছিল বৈদেশিক রাজনীতি, আন্তর্দেশিক বোঝাপড়া যাকে আমরা কূটনীতি বলি। আমরা দেশের সাথে দেশের এই নতুন বোঝাপড়ার ইতিহাস পড়ব। আমাদের উদ্দেশ্য হবে এটা বোঝা যে কূটনীতি ইতিহাসের একটি আঙ্গিক হিসাবে কাজ করে। ১৯১৭ সালে রাশিয়াতে বলশেভিক বিপ্লবের পর সমস্ত পৃথিবীটা আস্তে আস্তে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের (East and West) বিরোধ একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাচ্ছিল। এর মধ্যে কূটনীতি নামক ইতিহাসের একটা বড় আঙ্গিক কেমন করে বদলাচ্ছিল তা না জানলে মানবসমাজের আন্তর্জাতিক দেওয়া নেওয়ার প্রেক্ষিতটা আমরা বুঝতে পারব না। সেটা বোঝাই আমাদের বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য। আরেকটি কথাও এর সঙ্গে বোঝা দরকার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে কূটনীতির বেশীর ভাগটাই ছিল গোপন আলাপ-আলোচনার ধারা। এই গোপনীয়তা, শিবিরে শিবিরে সন্দেহ ও সংঘাত, আড়ালে আড়ালে সমর-সরঞ্জাম নিয়ে প্রস্তুতি বিশ্বযুদ্ধকে ডেকে নিয়ে এসেছিল। এর থেকে বের হয়ে আসার একটা ধারাও ছিল। তার মধ্যে কি নতুন কোন কূটনীতির আভাস আমরা দেখতে পাই? এ আভাস কি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই দেখা দিয়েছিল? সে আভাস কি কোনদিন পরিণতি লাভ করেছিল? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমরা খুঁজব এই এককের পাঠশালায়। এই খোঁজার মধ্য দিয়ে জাগবে ইতিহাসের নতুন বোধ। এই বোধকে জাগানোই এই এককের উদ্দেশ্য।

৪(খ).১ প্রস্তাবনা

বিবদমান দুই দেশের মধ্যে একটি সম্পর্ক হল লড়াইয়ের সম্পর্ক যার একটি চরম ও উৎকট পরিণতি হতে পারে যুদ্ধ। কিন্তু যুদ্ধ একটি অভিশাপ। তা মানবসমাজের পক্ষে কোনদিন মঙ্গালের হয়নি, হতেও পারেনা। তার কারণ যুদ্ধ একটি আপৎকালীন ঘটনা, মানুষের লোভ-ঈর্ষা-দ্বেষ ও দম্ভের এক চরম পরিণতি। তাই যুদ্ধকে ঠেকিয়ে রাখতে হয় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে, লোভ ও ঈর্ষাকে সংযত করে, দ্বেষ ও দম্ভকে প্রশমিত করে। কূটনীতি হল এই আলাপ-আলোচনা, একটি দেশের মৌলিক স্বার্থ ও চাহিদার সাথে অন্যদেশের মৌলিক স্বার্থ ও চাহিদার সামঞ্জস্য বিধান। প্রত্যেক দেশ তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শান্তি চায়, অর্থাৎ চায় আক্রমণ থেকে অব্যাহতি (immunity)। তার জন্য তার দরকার হয় মিত্রশক্তির (ally)। শান্তি, মৈত্রী ও আক্রমণ থেকে অব্যাহতি এই তিনকে সামনে রেখে একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের হাতিয়ার রূপে কাজ করে কূটনীতি।

ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে কূটনীতির প্রথম উদ্ভব হয়েছিল 'ইতিহাসের ঊষাকালে' ('at the dawn of history') যখন নর-বানররা (anthropoid apes) গুহাবাসী হয়ে শিকার-সন্ধানী হতে শুরু করেছিল তখন থেকে। তারা বুঝতে পেরেছিল যে এক একটি এলাকার নর-বানর গোষ্ঠীর শিকারের এলাকা ভাগ করে নেওয়া উচিত আপোষের মাধ্যমে, লড়াই আর পারস্পরিক হত্যার মধ্য দিয়ে নয় ["There came a stage when the anthropoid apes inhabiting one group of caves realised that it might be profitable to reach some understanding with neighbouring groups regarding the limits of their respective hunting territories"—Harold Nicolson, *The Evolution of Diplomatic Method*.]

এইভাবে আপোষের বোধ থেকে কূটনীতির সূত্রপাত। আর কূটনীতির প্রথম নীতি—প্রতিপক্ষের প্রতিনিধিকে হত্যা করা যাবে না। স্থির হল তখনই যখন নর-বানর বা আদিম মানুষ বুঝতে পারল যে আপোষ ও সন্ধির জন্য এগিয়ে আসা বিরোধীপক্ষের প্রতিনিধিকে হত্যা করলে কোন লাভজনক পরিস্থিতিতে উপনীত হওয়া যায় না। ["It must have been soon realised that no negotiation could reach a satisfactory conclusion of the emissaries of either party were murdered on arrival."—ঐ] এর থেকে জন্ম নিল সেই নীতি—দূত অবধ্য। প্রতিপক্ষের প্রতিনিধিকে হত্যা করা যাবে না। এইভাবে যে নীতির প্রতিষ্ঠা হল তা হল কূটনৈতিক অব্যাহতির নীতি ["Thus the first principle to become finally established was that of diplomatic immunity"—ঐ] এরপর যখন ধর্মের আবির্ভাব ঘটল তখন কূটনীতিকে ধর্মের সাথে বেঁধে দেওয়া হল। ধর্মের স্বার্থরক্ষা তখন কূটনীতির লক্ষ্য হল। ধর্মের অনুশাসনও কূটনীতির মধ্যে আরোপিত হল আর একটা নৈতিকতার আবরণের মধ্যে এনে যুদ্ধের ভয়াবহ নৃশংসতাকে স্তব্ধ করার চেষ্টা হল। সে চেষ্টা আজও চলেছে, অবশ্য ধর্মনিরপেক্ষ ভাবে, যেমনটি আমরা দেখি বর্তমান যুগের জেনেভা কনভেনশনে (Geneva Convention)।

কূটনীতির সবচেয়ে বড় তাত্ত্বিক ভাষ্যকার হ্যারল্ড নিকলসন (Harold Nicolson) বলেছেন যে ইউরোপে কূটনীতির বিবর্তনে তিনটি ধারা আছে—গ্রীক ও রোমান ধারা, ইটালীয় ধারা, ফরাসী ধারা। সনাতন কাল থেকে সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত কোন স্বতন্ত্র ব্রিটিশ বা জার্মান বা রুশ ধারা ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেননি। গ্রীক ও রোমানরা প্রথম আন্তর্জাতিক দেওয়া নেওয়ার কলকব্জা ('apparatus of international intercourse') তৈরী করেছিল। পরভূমে স্থায়ীদূত বা কনসাল (consul) নিয়োগের ব্যবস্থা তারাই করেছিল। তারাই এই প্রথা চালু করেছিল যে আন্তর্জাতিক আলাপ-আলোচনার থেকে যদি কোন চুক্তির (Treaty) উদ্ভব হয় তবে তা পাষাণ ফলকে খোদাই করে রাখা হবে।

রোমানরা কোনদিন পেশাদারী কূটনীতিকে (professional diplomacy) বুঝতে পারেনি, কারণ তাদের অখণ্ড ও বৃহৎ সাম্রাজ্যের বড়মাপের প্রতিপক্ষ ছিল না। ফলে আন্তর্জাতিক দেওয়া-নেওয়া লুকোচুরি কিছু ছিল না। রোমান সাম্রাজ্য ভেঙে যাওয়ার পর জাতীয়রাষ্ট্রের উদ্ভব হল। আরম্ভ হল একদেশের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাথে অন্য দেশের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সামঞ্জস্যবিধান (adjusting rival claims), জাতীয় নিরাপত্তাকে সুরক্ষিত করা, শত্রুকে এড়িয়ে যাওয়া বা প্রশমিত করার প্রয়াস, বন্ধু খোঁজার তৎপরতা। এইবার কূটনীতি শাণিত হল। গ্রীকদের নগররাষ্ট্র (City-state) আর মধ্যযুগের ইউরোপের জাতীয় রাষ্ট্র (national state) এক নয়। রোমানদের অখণ্ড সাম্রাজ্যের অটল সার্বভৌমত্ব গ্রীক নগররাষ্ট্রের সঙ্কীর্ণতা ও ষড়যন্ত্রপ্রিয়তাকে ঢেকে দিয়েছিল। সেই সার্বভৌমত্ব যখন তলিয়ে গেল, যখন সেই টুকরো হয়ে যাওয়া সার্বভৌমত্বের ভগ্ন অংশের আধার হয়ে রইল জাতীয় রাষ্ট্রগুলি তখন কূটনীতির রূপ বদলাতে লাগল। পোপ ঐতিহ্য ক্ষমতার জন্য লড়াইতে নামলেন, সম্রাট ধর্মীয় নেতার মহিমা কেড়ে নিতে চাইলেন; পবিত্র রোমান সম্রাট (Holy Roman Emperor) আর ঐতিহ্য ঐক্যের প্রতীক রইলেন না, খ্রীস্টতন্ত্রের সর্বজনীন সংহতি (Universal Unity of Christendom) ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এবার জাতীয় রাষ্ট্রের সাথে জাতীয় রাষ্ট্রের দেওয়া-নেওয়ায় অনেক জটিলতা-কুটিলতা দেখা দিল। কূটনীতি এখন অনেক কৌশল, বুদ্ধি, গণনা ও আদান-প্রদানের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। কূটনীতি হয়ে দাঁড়াল রাষ্ট্র পরিচালনার একটি শাখা (diplomacy became one of the branches of statesmanship)। ভেনিস, জেনোয়া প্রভৃতি শহরগুলি উদীয়মান অটোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করে বিত্তশালী হওয়ার আকাঙ্ক্ষায়

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামল। এর আগেই বাইজানটাইন সাম্রাজ্য কূটনীতির ছলাকলা আয়ত্ত করে ফেলেছিল। তারাই প্রথম পররাষ্ট্রনীতির পরিচালনার জন্য সরকারের একটি বিশেষ দপ্তর খুলেছিল। তাদের কাছ থেকে কূটনীতির রীতি ও নীতি শিখেছিল ভেনিস (Venice)। আর ভেনিসের কাছ থেকে শিখেছিল সারা ইউরোপ—প্রথমে ইটালীর ছোট ছোট রাজ্যগুলি এবং পরে ইটালীর বাইরে বড় রাজ্যগুলি। আর ভেনিসের সবচেয়ে পরিপূর্ণ কূটনৈতিক শিক্ষা এসেছিল বাইজানটাইন সাম্রাজ্য থেকে ("It was the Byzantines who taught diplomacy to Venice; it was the Venetians who set the pattern for the Italian cities, for France and Spain, and eventually for all Europe"—Harold Nicolson)। বাইজানটাইনদের কাছ থেকে ইটালীয়রা শিখেছিল কূটনীতিতে প্রোটোকল ও আনুষ্ঠানিকতা (protocal and ceremonials)। আর তার সঙ্গে তারা মিশিয়েছিল তাদের কূটনীতি—ছোট ছোট নগররাষ্ট্রের ক্ষুদ্র স্বার্থের লড়াই, তার ছলাকলা। দীর্ঘস্থায়ী নীতির মূল্য ("value of long-term policies") কিংবা ধীরে ধীরে প্রতিপক্ষের বিশ্বাসভাজন হওয়ার নীতির ("policy of the gradual creation of confidence") গুরুত্ব তারা বুঝত না। রোমানদের ছিল বিরাট সাম্রাজ্য, বিরাট প্রতিপত্তি, দুর্ধর্ষ প্রভাব। সেখানে ক্ষুদ্রস্বার্থের কূটনীতি, স্বল্পসময়ের মুনাফা (Short-term gain) ভিত্তিক আদানপ্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক ছলাকলা অনুপস্থিত ছিল। তা এল যখন বিরাট এবং অখণ্ড সাম্রাজ্যের ছত্রছায়া অপসারিত হল আর তার স্থানে দেখা দিল ছোট ছোট জাতীয় রাষ্ট্র (national states) এবং আরও ছোট নগররাষ্ট্র (city-states)। জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভবের সময় থেকে ক্ষুদ্রস্বার্থের কূটনীতি পঞ্চদশ শতাব্দীতে এসে ইটালীয় সঙ্কীর্ণ রাজনীতির মধ্যে তার পরিণতি লাভ করে ("Yet the diplomatic method that emerged from the fifteenth century was essentially an Italian Method"—Harold Nicolson)। জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব থেকে পরিবর্তিত হয়ে ইটালীয়দের হাতে যে কূটনীতি আত্মপ্রকাশ করল তা শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিরাট ঝুঁকি নেওয়ার খেলা, স্বল্পমেয়াদী মুনাফা আর প্রত্যক্ষ সাময়িক স্বার্থের প্রতিপালনমাত্র যা পরিচালিত হত উত্তেজনার মধ্য দিয়ে আর সেখানে ধূর্ত কুটিল ও নির্দয় মনেরই সমন্বয় ঘটত ("To them the art of negotiation became a game of hazard for high immediate states, it was conducted in an atmosphere of excitement, and with the combination of cunning, recklessness and ruthlessness"—Harold Nicolson)।

৪(খ).২ প্রারম্ভিক কথা

ওপরের আলোচনা পাঠ করলেই বোঝা যাবে যে সেটি হচ্ছে মূলতঃ হ্যারল্ড নিকোলসনের (Harold Nicolson) দেওয়া কূটনীতির বিবর্তনের একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা। হ্যারল্ড নিকোলসন ইদানীংকালের কূটনীতির বিবর্তনের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় প্রতীচ্য ভাষ্যকারদের মধ্যে একজন এবং প্রাচীন কূটনীতি (Old diplomacy) এবং নয়া কূটনীতির (New diplomacy) পার্থক্যের আলোচনায় তাঁর মতটিকেই বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়। বলা যেতে পারে যে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কূটনীতির ধারা হল প্রাচীন কূটনীতির ধারা। গ্রীক, রোমান ও ইটালীয় ধারার সাথে ফরাসী কূটনীতিক চিন্তা মিশে এই ধারাকে সৃষ্টি করেছিল। রোমান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাওয়ার অনেকদিন পরে ইউরোপে দুটি শক্তি মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল—একটি হল প্যাপাসি (Papacy) বা পোপতন্ত্র, আরেকটি হল হোলি রোমান এম্পেরর (Holy Roman Emperor) বা পবিত্র রোমান সম্রাটের

শাসনতন্ত্র। ফ্রান্সের সম্রাট একাদশ লুই (Louis XI) ফ্রান্সকে একটি তৃতীয় শক্তিতে পরিণত করেন। ১৪৬১ থেকে ১৪৮৩ সালে তাঁর রাজত্বের মধ্যে তিনি ইউরোপের কূটনীতিতে বিপর্যয়কর পরিবর্তন এনেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল "সাফল্য যাঁর আছে সম্মান তাঁরই" ("he who has success has honour")। নীতি, প্রতিশ্রুতি, চুক্তি, অঙ্গীকার এগুলির কোন গূঢ় মূল্য নেই। স্বার্থের প্রয়োজনে চুক্তি করা যায়, স্বার্থের প্রয়োজনে তা ভাঙা যায়। ধূর্ত ও বিবেকহীন (cunning and unscrupulous) এই মানুষটি তাঁর রাজত্বকালে অনেক চুক্তি করেছেন এবং অনেক চুক্তি ভেঙেছেন এবং তার দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে বাস্তব পরিস্থিতির যৌক্তিকতা নৈতিকতার থেকে বড় ("...the raison d' etat was above morality...")। এই বোধকেই পরে সূত্রাকারে প্রকাশ করেছিলেন ইটালীর রাষ্ট্রদার্শনিক ম্যাকিয়াভেলি (Machiavelli)। তিনি ইউরোপের রাজনীতিতে এই সূত্রকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে লক্ষ্যই হচ্ছে আসল, কোন পথে, কোন মাধ্যমে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে তা গৌণ, অর্থহীন। তাঁর রচিত 'দ্য প্রিন্স' (The Prince) নামক গ্রন্থে তিনি লিখেছিলেন : "আমি বিশ্বাস করি যে রাষ্ট্রের জীবনে যদি আশঙ্কা নেমে আসে তবে রাজতন্ত্রই হোক বা প্রজাতন্ত্রই হোক, রাষ্ট্রের সংরক্ষণের জন্য বিশ্বাস ভঙ্গ করবে এবং অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করবে।" (I believe that when there is fear for the life of the state, both monarchs and republics, to preserve it, will break faith and display ingratitude.")। দুটি কথা মনে রাখা দরকার। এক, মধ্য যুগ থেকে কূটনীতি বিবর্তিত হয়েছিল দুধরনের পরিবেশের মধ্য দিয়ে, নিদারুণ ধর্মীয় যুদ্ধ ও নগররাষ্ট্রের অবস্থান, আর এই দুইই সরল এবং সবল কূটনীতির গড়ে ওঠার পক্ষে সহায়ক ছিল না। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার সাথে মিশে নগররাষ্ট্রের সঙ্কীর্ণতা, ষড়যন্ত্রপ্রবণতা, সন্দেহপ্রবণতা, ও বিশ্বাসহীনতা ইত্যাদির জটিল ধারা কূটনীতিকে আড়ষ্ট, নির্দয় ও নিষ্প্রাণ করে তুলেছিল। এই পরিবেশ থেকে কূটনীতিকে বাঁচিয়েছিলেন ওলন্দাজ আইনজ্ঞ ও পণ্ডিত *উগো গ্রোসিয়াস* (Hugo Grotius 1583-1645)। তিন বলেছিলেন যে ধর্মীয় লড়াই— কে ক্যাথলিক কে প্রটেস্ট্যান্ট— এই নিয়ে রক্তক্ষয়ী উন্মাদনায় গিয়ে লাভ নেই, কারণ এর দ্বারা পরস্পরের ঘাতপ্রত্যাঘাত ছাড়া আর কোন ফল লাভ হয় না। তার থেকে মোহাচ্ছন্ন ভাবনা —dogma-কে বাদ দিয়ে যদি শান্ত মনে ভেবে অনুসরণীয় কর্মসূচী ঠিক করে পরস্পরের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করা যায় তবে মানবসমাজের মঙ্গাল হবে। এইভাবে শান্ত পরিবেশে সুস্থিত কূটনীতির কথা বল্লেন গ্রোসিয়াস। তাঁর বই যুদ্ধ ও শান্তি সম্বন্ধে আইনের বিষয় (De Jure Belli ac Paeis যার ইংরাজি হল *Concerning the Laws of War and Peace*) [১৬২৫ সালে প্রকাশিত] একটি বিধিসম্মত কূটনীতির পরিকাঠামো তৈরি করেছিল। এই গ্রন্থ প্রকাশের পর থেকে ধীরে ধীরে কূটনীতিতে এইসব নিয়ম ও নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গ্রোসিয়াস যে কূটনীতির কথা বলেছেন তার চারটি নীতি প্রধান—(১) যুদ্ধ করতে হবে ন্যায়সঙ্গাত কারণে— 'for a just cause'— এবং একান্তভাবে আত্মরক্ষার জন্য; (২) পরাজিতের ওপর ততটুকু ক্ষতিই চাপিয়ে দেওয়া যাবে যতটুকু শুধু প্রয়োজন; (৩) জনগণের সঙ্গো জনগণের সম্পর্ক নির্ধারিত হবে শুধুমাত্র বলপ্রয়োগের দ্বারা নয় কারণ মানুষের সঙ্গো মানুষের সম্পর্কে যেমন একটা ন্যায়ের (justice) দিক আছে সেই রকম রাষ্ট্রের সঙ্গো রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ন্যায়নীতির একটা দিক থাকে; (৪) একজন সার্বভৌম শাসকের প্রকৃত শক্তি নিহিত থাকে চুক্তিপালনের মধ্যে, চুক্তি ভঙ্গোর মধ্যে নয়। অতএব একজন শাসক বুদ্ধির পরিচয় দিতে পরেন চুক্তিকে সরংক্ষণ করে, শান্তিপূর্ণ আদান প্রদানের পথকে প্রশস্ত করে। এই নীতিগুলিকে জ্ঞানকোষের (Book of Knowledge) ভাষ্যকাররা 'counsels of perfection' বলেছেন।

উগো গ্রোসিয়াসের মত আরেকজন ব্যক্তিও সনাতন কূটনীতির ধারাকে পরিশীলিত করেছিলেন। তিনি হলেন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী কার্ডিনাল রিশলে (Cardinal Richelieu 1585-1642— উচ্চারণ rēsh´lyê)। এই কঠিন,

নির্দয় ও রাগী মানুষটি কুড়ি বছর ক্ষমতায় ছিলেন এবং তাঁর আমলে ফ্রান্স কূটনীতির নানা সাফল্য অর্জন করেছিল। তিনি তাঁর সমকালীন মানুষদের শিখিয়েছিলেন যে রাষ্ট্রের স্বার্থই প্রধান ও চিরন্তন এবং তা সমস্ত আবেগ, আদর্শ ও তত্ত্বগত আচ্ছন্নতার ওপরে— "... the interest of the State was primary and eternal; and that it was above sentimental, ideological and doctrinal prejudices and affections.")। তাঁর সমস্ত দূতদের (ambassadors) তিনি শিখিয়েছিলেন যে চুক্তি হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল। প্রথম পর্যায়ে আলাপ আলোচনা (negotiation), দ্বিতীয় পর্যায়ে স্বাক্ষর (signing of the treaty) এবং তৃতীয় পর্যায়ে অনুমোদন (ratification)— এই তিন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যে দলিল নিশ্চিত হয় তাকে মর্যাদা দেওয়া সবচেয়ে বড় কর্তব্য। এর পরের কথা আরও গুরুত্বপূর্ণ। যে সব উপাদান নিয়ে কূটনীতি গঠিত হয় তার সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণটিই হল নিশ্চিতি। রিশলে ক্ষমতায় এসেছিলেন ১৬১৬ খ্রীস্টাব্দে। সেই সময় থেকে ১৭৮৯ সালের ফরাসীবিপ্লব পর্যন্ত একশত ষাট বছর ইউরোপে কূটনীতিক ব্যবস্থা ও আদব-কায়দা যা চালু ছিল তা হল ফ্রান্সের মডেলে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা ["...the diplomatic method of France became the model for all Europe"— Harold Nicolson.]। ফ্রান্সের কূটনৈতিক মডেলটি সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর [জন্ম ১৬৩৮, রাজত্বকাল ১৬৪৩—১৭১৫] সময়ে পরিণতি লাভ করে। মডেলটি এই রকম ঃ

১) কূটনৈতিক কাজের বিস্তার (elaborate diplomatic service)।

২) রোম, ভেনিস, কনস্টান্টিনোপল, ভিয়েনা, হেগ, লন্ডন, মাদ্রিদ, লিসবন, মিউনিক, কোপেনহাগেন, বার্ন ও অন্যান্য বহু অঞ্চলে দূতাবাস স্থাপন—অর্থাৎ দেশে দেশে স্থায়ী দূতাবাস স্থাপন।

৩) প্রয়োজন বোধে দেশে দেশে বিশেষ দূত (Special Missions) প্রেরণ।

৪) দূতদের নিয়মিত আদেশ ও পরামর্শ প্রেরণ (Instruction to ambassadors)।

৫) কূটনৈতিক স্টাইলের ওপর গুরুত্ব আরোপ (importance attached to style)

6) কতিপয়ের দ্বারা কূটনীতির নিয়ন্ত্রণ (diplomacy to be handled by a few) [চতুর্দশ লুই মুক্ত আলোচনার 'open negotiations' এর বিরোধী ছিলেন]

জাতীয় রাষ্ট্র ও নগর রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক আদান-প্রদানের যে সঙ্কীর্ণ মনোভাব, সে সন্দিগ্ধতা, যে প্রতিযোগিতা জর্জর স্বার্থন্বেষণের চেষ্টা তা এসেছিল ইটালির কাছ থেকে। ফ্রান্স দিয়েছিল কূটনীতির প্রকরণ বা পদ্ধতি। চতুর্দশ লুই-এর সময় থেকে ইউরোপীয় কূটনীতিতে ফরাসী প্রভাব প্রধান ও সর্বজনীন হয়ে দাঁড়ায় ["...it was during the reign of Loui XIV that French influence on diplomatic method became predominant and Universal."— Harold Nicolson]

৪(খ).৩ উনিশ শতকে কূটনীতির বৈশিষ্ট্য

ইউরোপের কূটনীতির প্রবহমান ধারা উনিশ শতকে এসে বিভাজিত হল। একটি ধারা হল পবিত্র মৈত্রীর (Holy Alliance) ধারা, আর অন্যটি হল কংগ্রেস ও কনফারেন্সের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার বাস্তব ভিত্তি নির্ণয়ের ধারা, ("Two conflicting schemes were put forward which were often confused

with each others. The first was that of the Holy Alliance,...”। “The Alliance was followed by a real attempt in congress and conference to bring about a practical international cooperation...”—D. M. Ketelbey, *A History of Modern Times* From 1789 TO THE PRESENT DAY] পবিত্র মৈত্রী (Holy Alliance) চিরায়ত ইউরোপীয় কূটনীতির ধারার মধ্যে কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারেনি, কিন্তু কিছুটা ধর্মীয় সততাকে সামনে রেখে ইউরোপীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে একটি নতুন বন্ধন আনতে চেয়েছিল। খ্রীস্টধর্মের সবচেয়ে পবিত্র অক্ষয় ত্রয়ীর নামে” (“in the name of the most Holy and Indissoluble Trinity”) ইউরোপের শাসকরা “পবিত্র ধর্মের নিগূঢ় সত্যকে” (“the sublime truths of Holy Religion”) তাঁদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কাজে ব্যবহার করার অঙ্গীকার করলেন। তাঁরা জানালেন যে “একটি সত্য ও অক্ষয় সৌভ্রাত্রের বন্ধনে আবদ্ধ (“united in bonds of a true and indissoluble fraternity”) ভাইদের মত এবং এক মহৎ খ্রীষ্টীয় জাতির সদস্যরূপে (“like members of one great Christian nation”) তাঁরা স্বীকার করে নিলেন যে পৃথিবীতে একমাত্র তিনি (ঈশ্বর) ছাড়া আর কোন সার্বভৌম শাসক নেই—তাঁর কাছেই সমস্ত ক্ষমতা নিমজ্জিত” (“the world has in reality no other sovereign than Him to whom alone all power really belongs.”)। এই ধরনের ঈশ্বর ও ধর্মভিত্তিক আদর্শবাদ ইতিপূর্বে ইউরোপের কূটনীতিতে আর কখনো এমনভাবে ঘোষিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে রাসিযার জার প্রথম আলেকজান্ডার ছাড়া আর কোন শাসকই পবিত্র মৈত্রীকে একটা গ্রাহ্য বিষয় বলে মনে করেননি। ইংল্যান্ডের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে কাসেলরি (Castlereagh) এই মৈত্রীকে “একটি নিগূঢ় রহস্যবাদ ও নিরর্থকতা” (“a piece of sublime mysticism and nonsense”) বলে বর্ণনা করেছিলেন। মেটারনিক (Metternich) [১৭৭৩—১৮৫৯] এই মৈত্রীকে একটি ‘উচ্চ ঘোষিত শূন্যতা’ (“loud-sounding nothing”) বলে উল্লেখ করেছেন। পবিত্র মৈত্রীর উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয় শাসকদের খ্রীষ্টীয় আদর্শে উদ্দীপিত একটি ভ্রাতৃত্বকে (“a brotherhood of sovereigns inspired by Christian ideals”) গড়ে তোলা। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে যা আত্মপ্রকাশ করল তা হল অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর প্রিন্স মেটারনিকের নেতৃত্বে বৃহৎ শক্তিগুলির একনায়কতন্ত্র’ (‘dictatorship of the Great Powers’)। ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে রাশিয়া, প্রশিয়া, অস্ট্রিয়া ও গ্রেট ব্রিটেন চতুঃশক্তির মৈত্রী (Quadruple Alliance) স্বাক্ষর করল। তারপর থেকে ১৮১৮ থেকে ১৮২২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে এইক্স-লা-স্যাপেল (Aix-la-Chapelle, ১৮২২) কংগ্রেসের অধিবেশনের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদ, গণউত্থান, বিপ্লব ইত্যাদি সমস্ত সম্ভাবনার বিরুদ্ধে ইউরোপীয় বৃহৎশক্তির শাসকরা একটি জোট গড়ে তুললেন। এই জোট হল একটি মহাদেশীয় সংগঠন—ইউরোপীয় জোট (concert of Europe) যার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও শান্তির পরিবেশ রচনা করার চেষ্টা হয়েছিল। জাতীয় রাষ্ট্রগুলির দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জনিত দ্বন্দ্বের ফলে কূটনীতিতে যে আন্তর্জাতিক তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা হল শক্তি সাম্যের তত্ত্ব (theory of the balance of powers)। ইউরোপীয় জোটের মধ্য দিয়ে নতুন একটি শক্তির সমবায় গঠিত হতে পারত যা ইউরোপীয় কূটনীতিতে শক্তিসাম্যের এক সমান্তরাল ধারণার জন্ম দিতে পারত। কিন্তু ইউরোপীয় জোট ছিল ক্ষণস্থায়ী। ইংল্যান্ডের সরে আসার ফলে এবং ইউরোপীয় শক্তিগুলির নিজেদের মধ্যে সন্দেহ ও দ্বন্দ্বের ফলে সেই জোট ভেঙে যায়। কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে জোট গড়ার কূটনীতিকে ডেভিড টম্পসন (David Thompson, Europe Since Napoleon) ‘কংগ্রেস কূটনীতি’ (‘Congress Diplomacy’) বলেছেন। এই কূটনীতি শেষ পর্যন্ত মেটারনিক ও ব্রিটেনের অনুসৃত শক্তি সাম্যের নীতির সঙ্গে

জার আলেকজান্ডার কথিত পবিত্র মৈত্রীর নীতির মধ্য দিয়ে জোটবদ্ধ হস্তক্ষেপের নীতির পার্থক্যকে জোরের সঙ্গে স্পষ্ট করে তুলেছিল ("The only other result of the Congress was to emphasize the continued contrast between the 'balance of power' policies of Metternich and Britain, and the 'Holy Alliance' policies of concerted intervention favoured by Russia"—David Thompson)।

এ কথা মনে রাখা দরকার যে ১৮১৫ সালের ভিয়েনা সম্মেলনের সামনে চ্যালেঞ্জ ছিল বিরাট—ফরাসী সামরিকতা (French Militarism) থেকে ইউরোপকে বাঁচাতে হবে এবং উদারনৈতিকতা (liberalism) ও জাতীয়তাবাদ (nationalism) নামক দুই নবোদ্ভূত বিভীষিকা থেকে রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ত্রাণ করে বিপ্লবের বাতাবরণের বাইরে ভিন্নতর সুস্থিতির মধ্যে তাকে পুনর্বাসিত করতে হবে। তাই ইউরোপের কূটনীতির মধ্যে ন্যায়নীতি বা Legitimacy-র কথা জোর দিয়ে বলতে হয়েছিল এবং তার আবরণে কায়েম করতে হয়েছিল রাজতান্ত্রিক শাসনের ইস্তাহার যা কোনভাবেই জনগণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার অনুসারী ছিল না। স্যার হ্যারোল্ড নিকোলসনের (Sir Harold Nicolson) মতকে সমর্থন করে ঐতিহাসিক সিম্যান (L.C.B. Seaman, From Vienna to Verrailles) বলেছেন যে ১৮১৫ সালের ভিয়েনা সম্মেলনে সমবেত হওয়া কূটনীতিবিদদের সম্বন্ধে প্রথম মতটিকে আমরা বর্জন করতে পারি—তা হলো যে এই কূটনীতিবিদরা কূটনীতির বাজারে ছিলেন ক্ষুদ্রপণ্য বিক্রেতা ভাড়াটে ফেরিওয়ালা যারা লক্ষ লক্ষ জনগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে সুরভিত হাসির দ্বারা বিকিয়ে দিয়েছিলেন ("mere hucksters in the diplomatic market, bartering the happiness of millions with a scented smile.")। আমরা গ্রহণ করতে পারি দ্বিতীয় মতটি যে মত অনুযায়ী ভিয়েনার কূটনীতিবিদরা রুখে দিয়েছিলেন এক শতাব্দী পরিমাণ সময়ের জন্য একটি বৃহৎ ইউরোপ? যুদ্ধকে" ("they did in fact present a general *European Conflagration for a whole century of time*.")। একদিকে এই বৃহৎ ইউরোপীয় যুদ্ধ ঠেকানোর এবং অন্যদিকে উদারনীতি ও জাতীয়তাবাদের সংক্রামক আদর্শকে রোধ করার ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য নিয়ে উনিশ শতকের প্রারম্ভে কূটনীতি তার যাত্রা শুরু করেছিল। হাতিয়ার হিসাবে নিতে হয়েছিল খ্রীষ্টীয় ধারণাকে, নিতে হয়েছিল রাজতান্ত্রিক ঐক্যের প্রতিশ্রুতিকে, অগ্রসর হতে হয়েছিল কখনো বা জার আলেকজান্ডারের স্ফটিকস্বচ্ছ আদর্শবাদের পথে, কখনো বা কংগ্রেসের উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে কাসেলরি ও মেটারনিকের প্রদর্শিত প্রতিক্রিয়াশীল পথে। কিন্তু যাই ঘটুক না কেন উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপীয় কূটনীতিতে এক সর্ব ইউরোপীয় মন গড়ে উঠেছিল। পবিত্র মৈত্রী (Holy Alliance) ইউরোপীয় কূটনীতির মধ্যে এক নৈতিক মনন এনে দিয়েছিল যে নৈতিক মনন পরবর্তীকালে নয়া কূটনীতির আবির্ভাবের সহায়ক হয়েছিল। আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে নৈতিকতার উপস্থাপনা এবং একটি ইউরোপীয় বিবেকের উন্মীলন, ঐতিহাসিক লিপসনের ভাষায়, শেষ পর্যন্ত পবিত্র মৈত্রীর দান ("The Holy Alliance was nominally, then, an attempt to apply the principles of morality to international diplomacy, in others words to create in Europe a political conscience"—E.Lipson, Europe in the 19th & 20th Centuries.)।

৪(খ).৪ উনিশ শতকের কূটনীতিতে গোপনীয়তার সবিশেষ অভ্যুদয়

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপীয় কূটনীতি দুটি কাজ করে উঠতে পারেনি—এবং পবিত্র মৈত্রীর স্বচ্ছ প্রাণকে একটি শরীরী অবয়বে ঢেকে দিতে ("to provide the transparent soul of the Holy Alliance

with a body") পারেনি। আর, দুই উদারনৈতিকতা ও জাতীয়তাবাদকে রুখে দেওয়ার জন্য যে ইতিবাচক কূটনীতির প্রবর্তন করতে হয় তাকে ভিয়েনার কূটনীতিবিদরা জন্ম দিতে পারেনি। তাঁরা ভিয়েনাতে যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন তাতে ইউট্রেক্টের চুক্তি (Treary of Utrectt, ১৭১৩, এই চুক্তির দ্বারা স্পেনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসান হয়েছিল) বা ভার্সাই চুক্তির মত কোন দেশের বা কোন জাতির অন্তঃকরণে কোন যন্ত্রণার উদ্রেক হয়নি। ইউট্রেক্টের চুক্তি হ্যাপসবার্গদের (Hapsburgs) মনে জ্বালা ধরিয়েছিল এবং তার বাণিজ্যিক শর্তগুলি ভবিষ্যতে ফ্রান্স ও স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাহস জুগিয়েছিল। ভার্সাই চুক্তি (১৯১৯) জার্মানিকে নির্মমভাবে আঘাত করেছিল এবং নিজের জঠরে আরেকটা বড় যুদ্ধের বীজকে ধারণ করে রেখেছিল অত্যন্ত সংগোপনে। সে অর্থে ভিয়েনার কূটনীতি কোন বড় যুদ্ধের সম্ভাবনাকে উৎসাহ দেয়নি, কিন্তু সে যা করেছিল তা হল প্রগতির পথকে অবরুদ্ধ করে দিয়েছিল। বলা হয়ে থাকে যে ভিয়েনার কূটনীতিকরা সময়ের ঘড়িকে পিছিয়ে দিতে চাননি, তাঁরা পরবর্তী অর্ধশতাব্দীর জন্য তাকে ১৮১৫ তেই আটকে রাখতে চেয়েছিলেন ("The fault of the Vienna statesmen is not that they put the clock back in 1815...their error was that they hoped to keep the clock stopped at 1815 for the next half a century:—L.C.B. Seaman, *From Vienna to Versailles*)। কিন্তু ঘটনার প্রবাহ এগিয়ে গিয়েছিল থেমে থাকেনি। তাই একটা পর্যায়ের পর—মূলতঃ ১৮৭০-এর পর—ইউরোপের কূটনীতিকে দ্রুত বদলাতে হয়েছিল পরিবর্তনশীল ঘটনার প্রবাহের সঙ্গে তাল রাখার জন্যে। ১৮৭০ সালে শেষ হয়েছিল ইতিহাসের একটা অধ্যায় যে অধ্যায়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গঠনশীল আন্দোলন (formative movements) পরিণতির দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। আর তার থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছিল ঐক্যবদ্ধ জার্মান সাম্রাজ্য, ইটালীর ঐক্যবদ্ধ রাজ্য, তৃতীয় প্রজাতন্ত্র ও দ্বৈতরাজতন্ত্র (Dual Monarchy)। এর মধ্যে জার্মানিই ছিল ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত একটি শক্তিশালী সামরিক সাম্রাজ্য। ঐক্যবদ্ধ হলেও এ সাম্রাজ্য তখন পর্যন্ত ছিল একটি ভ্রূণের মত অপরিণত। এর একটি একাগ্র রাজনৈতিক সত্তা তখনও সৃষ্টি হয়নি ("But as yet the new state existed only in an embryonic form. It lacked a corporate political existence"—Lipson)। এদিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ঘটনা থেকে এ সাম্রাজ্যে এসেছিল নতুন বিপন্নতা। ফ্রান্সকে পরাজিত করে (সেদানের যুদ্ধে ১৮৭০ সালে) তার কাছ থেকে আলসাস-লোরেন (Alsace-Loeraine) কেড়ে নিয়ে জার্মান সাম্রাজ্য গঠিত হয়েছিল। সেদানের যুদ্ধের পরাজয়কে ফরাসীরা শেষ কথা, ইতিহাসের অপরিবর্তনীয় রায় বলে মেনে নেয়নি। এ কথাও মেনে নেয়নি যে আলসাস-লোরেনের হস্তচ্যুতি একটি অলঙ্ঘনীয় বিধান। এর পর থেকে ফরাসীদের অন্তরের অদম্য কথাটি হল revanche—প্রতিশোধ। আলসাস-লোরেন জার্মানির কাছে হয়ে দাঁড়াল ফরাসী বন্ধক (French Mortgage)। একজন জার্মান ঐতিহাসিক লিখেছেন যে "শুরু থেকেই জার্মান সাম্রাজ্যের কাঠামো একটি ফরাসী বন্ধকের দ্বারা ভারাক্রান্ত ছিল কারণ যে কোন বিদেশী শত্রু এর পর থেকে নিঃশর্তভাবে ফরাসী সমর্থনের ওপর নির্ভর করতে পারত ("from the very outset the new structure of the German Empire was burdened as it were by a French mortgage, since every foreign foe could henceforth reckon unconditionally on French support.)। ফ্রান্সে তখন প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়েছে। সেখান থেকে বিপ্লবের হাওয়া এসে জার্মানির রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাজানো বাগানকে বিপর্যস্ত করে দিতে পারত। বিসমার্ক তাই বলেছিলেন "আমরা চাই ফ্রান্স আমাদের শান্তিতে থাকতে দিক" ("We want France to leave us in peace.")। তাঁর লক্ষ্য ছিল একটাই— যে করেই হোক ফ্রান্সকে নিঃসঙ্গ রাখতে

হবে। তিনি বলেছিলেন যে যতদিন না ফ্রান্স তার মিত্রকে খুঁজে পাবে ততদিন সে জার্মানির কাছে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে না" ("As long as France has no allies she is not dangerous to Germany.") অতএব তাঁর লক্ষ্য হল একটাই—"ফ্রান্সকে বন্ধু পাওয়া থেকে বিরত রাখতে হবে" ("We have to prevent France finding an ally.")।

বিসমার্কের এই উদ্দেশ্য থেকেই জন্ম নিয়েছিল গোপন কূটনীতি। তিনি অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়া উভয়কেই এ কথা বোঝাতে পেরেছিলেন যে প্যারিস কমিউন, জার্মান সোস্যাল ডেমোক্র্যাসি এবং নিহিলিজম (রাশিয়াতে আবির্ভূত ধ্বংসের দর্শন) ইউরোপে সব রাজতান্ত্রিক দেশের পক্ষে বিপজ্জনক। এর থেকেই জন্ম নিয়েছিল ড্রেই কাইজার বান্ড বা তিন সম্রাটের লীগ (League of three Emperors, 1872), অস্ট্রো-জার্মান মৈত্রী (Austro-German Alliance, 1879), এবং ত্রিশক্তির মৈত্রী (Triple Alliance, ১৮৮২)। মনে রাখতে হবে যে স্ল্যাভ রাশিয়াকে আড়াল করেই অস্ট্রো-জার্মান মৈত্রী সম্পাদিত হয়েছিল আর রাশিয়া মনে করেছিল যে এই মৈত্রী ও ১৮৭৮ সালের বার্লিন কংগ্রেসে জার্মানির ভূমিকা নিদারুন বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর মাত্র। কারণ, ১৮৭০ সালে ফরাসী-জার্মান লড়াইয়ের সময় রাশিয়া জার্মানিকে সমস্ত রকম সাহায্য দিয়েছিল। এবার জার্মানিও গোপনে রাশিয়ার কাছ থেকে সরে গেল। গোপন কূটনীতির ফলে জার্মান ভাষাভাষী মানুষরা নিজেদের সংহতি রচনা করল ঠিকই কিন্তু রাশিয়ার স্ল্যাভরা ঝুঁকে পড়ল ফ্রান্সের দিকে। এরপর থেকে রাশিয়ার স্লোগান হল 'আমরা শক্তিশালী ফ্রান্স চাই' ("We need a powerful France")। ট্রিপল এ্যালায়েন্সের মুখোমুখি রাশিয়া-ফ্রান্স-ইংল্যান্ডের ট্রিপল আঁতাতের সূত্রপাত এইখানেই। গোপন কূটনীতি সারা ইউরোপকে দুটি সশস্ত্র শিবিরে (armed camp) বিভক্ত করে ফেলে আর তার থেকেই দেখা দিল বিশ্বযুদ্ধ। ১৮১৫ সালে ভিয়েনার চুক্তি যে মহাদেশব্যাপী যুদ্ধকে ঠেকিয়ে রেখেছিল গোপন কূটনীতি সেই যুদ্ধের দ্বারা অবারিত করে দিল। প্রথম আলেকজান্ডার—স্ল্যাভ রাশিয়ার জার যে রাজতান্ত্রিক ঐক্যকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন সেই একইরকম প্রতিক্রিয়াশীল ঐক্য বিসমার্কও গড়ে তুললেন তাঁর তিন সম্রাটের লীগের মধ্য দিয়ে। শুধু তফাৎ এই যে জারের পরিকল্পনায় খ্রীষ্টীয় নৈতিকতা ছিল, আর বিসমার্কের ব্যবস্থা ছিল একান্তভাবে বাস্তবতা-নির্ভর নৈতিকতা বিবর্জিত এক সংগোপন তৎপরতা ছিল, আর বিসমার্কের ব্যবস্থা ছিল একান্তভাবে বাস্তবতা-নির্ভর নৈতিকতা বিবর্জিত এক সংগোপন তৎপরতা মাত্র। সন্দেহ আর আক্রোশ, প্রতিশোধ স্পৃহা আর অনৈতিকতার আলিঙ্গান এই সবই ছিল গোপন কূটনীতির অন্তর্নিহিত পরিচালিকা শক্তি। এ সমস্ত কিছু থেকে জন্ম নিয়েছিল এক নির্দয় রণপ্রস্তুতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তারই পরিণাম।

৪(খ).৫ নয়া কূটনীতির জন্ম

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা ও ধ্বংস থেকে মানুষ বুঝতে পেরেছিল যে গোপন কূটনীতি মানুষের সভ্যতার পক্ষে কত ভয়ঙ্কর। তাই গোপন কূটনীতিকে পরিহারের প্রযোজনীয়তা দেখা দিল বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সময় থেকে। ১৯১৮ সালের ৮ জানুয়ারি আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন যুদ্ধের পর শান্তির বনিয়াদ কি হবে তা আলোচনা করতে গিয়ে মার্কিন কংগ্রেসের সামনে একটি বক্তৃতায় চৌদ্দ দফা শর্তের কথা বলেছিলেন। পরে এইটিই ইতিহাসে *Fourteen Points* বা চৌদ্দদফা শর্ত বলে বিখ্যাত হয়। এই শর্তাবলীর প্রথম শর্তই হল ঃ "খোলাখুলিভাবে উপনীত শান্তির খোলা ইস্তাহার"— "Open Covenants of peace, openly arrived at".

এই শর্তের মধ্য দিয়ে এইভাবে মুক্ত কূটনীতির ঘোষণা করা হল। এই মুক্ত কূটনীতিই হল নয়া কূটনীতি। এর দ্বারা যে শুধু গোপন কূটনীতির মূলোচ্ছেদের চেষ্টা হল তা নয়, ইউরোপের হাজার বছরের কূটনীতির অন্তর্নিহিত যে ভাব—রেষারেষি, সন্দেহ, প্রতিযোগিতা, গোপন তৎপরতা—তাকেও বাতিল করার চেষ্টা হল। রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন (Woodrow Wilson) তাঁর চতুর্থ শর্তে বলেছিলেন যে গার্হস্থ্য নিরাপত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই প্রত্যেক জাতি তার অস্ত্রশস্ত্র ও সমর সরঞ্জামকে ন্যূনতম বিন্দুতে কমিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দেবে— "Adequate guarantees given and taken that national armaments will be reduced to the lowest point consistent with domestic safety"। গোপন কূটনীতি ও গোপন রণপ্রস্তুতি যে গাঁটছড়া বেঁধে চলে আর তার ফলে যে সন্দেহ ও হানাহানি বৃদ্ধি পায় একথা জেনেই রাষ্ট্রপতি উইলন সমরসম্ভার কমাতে চেয়েছিলেন। শুধু তাই নয় তিনি জানতেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পেছনে উপনিবেশ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শক্তিশালী জাতিগুলির লোভাতুর মনে কি ভীষণ আক্রোশের সঞ্চার করেছিল। তাই তাঁর পঞ্চম শর্তে তিনি ডাক দিলেন স্বাধীন ও খোলা মনে এবং চরম পক্ষপাত শূন্যতার মধ্য দিয়ে সমস্ত ঔপনিবেশিক দাবীর মীমাংসা করতে হবে— "A free, open-minded and absolutely impartial adjustment of all colonial claims." এইভাবে মুক্তির নুতন বোধের মধ্যে পৃথিবীর কূটনীতিকে বসানোর চেষ্টা হল। এত ব্যাপকভাবে, এত প্রকাশ্যে এবং এত জোরের সাথে খোলামেলা কূটনীতির কথা এর আগে আর আলোচিত হয়নি। কূটনীতি সম্বন্ধে এই খোলামেলা ভাবনাকেই নয়া কূটনীতি বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ এক কথায় নয়া কূটনীতি হল খোলা কূটনীতি— Open diplomacy।

বিখ্যাত রাষ্ট্রনীতিবিদ হার্টম্যান (Frederick H. Hartmann, T*he Relations of Nations*) বলেছেন যে "গোপন" (secret) কূটনীতি থেকে "খেলা" (open) কূটনীতিতে উত্তরণ বর্তমান কালের একটি বড় ঘটনা। 'গোপন' কূটনীতি আর 'খোলা' কূটনীতির তফাৎটা এখানে বোঝা দরকার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত কোন দেশের বৈদেশিক নীতির অন্তরালে যে কূটনৈতিক তৎপরতা চলত তা সে দেশের মানুষ জানতে পারত না। বড় বড় শক্তিগুলি যে কূটনীতির চালু করেছিল তাতে গোপনে যুদ্ধের তৎপরতা চলত, অঙ্গীকার, প্রতি-অঙ্গীকার, দাবী, প্রতিদাবী সব মিলে মিশে যে পরিবেশ তৈরি করত তাতে জনগণের কোন ভূমিকা থাকত না। এইভাবে জনগণ জানতেও পারেনি ক্রমশঃ তারা দেশে-দেশান্তরে একটা বড় যুদ্ধের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে। এক কথায়, হার্টম্যান লিখছেন, অভিযোগটা হল এই রকম যে জনগণের সম্মতি ছাড়াই জনগণকে যুদ্ধে লিপ্ত করা হয়েছে ("In short, the argument was that the people had been committed to war ... without this consent:—Hartmann)। এই অনুভূতি এসেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। তাই হার্টম্যান লিখেছেন— "The shift from 'secret' to 'open' diplomacy followed World War I"। 'গোপন' কূটনীতি থেকে 'খোলা' কূটনীতিতে উত্তরণ ঘটেছিল ঠিক সেই সময়ে যখন জাতিসংঘ বা লীগ অফ নেশন (Legue of Nations) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু লীগ অফ নেশনস্ ছাড়াই হয়ত এর আবির্ভাব ঘটত। কারণ জনগণ বুঝতে শিখেছিল যে তাদের না জানিয়ে তাদের যুদ্ধে ঠেলে দেওয়া হয়েছে ("Open diplomacy had come into fashion because of widespread popular feeling that the secret intrigues of the Powers, carefully concealed from their own peoples, had led to a war over obligations, promises, and counterclaims that would not have stood the light of public scrutiny"—Hartmann গোপন কূটনীতির উদ্দেশ্য কি ছিল শুধুই নিজেদের ষড়যন্ত্রকে জনগণের কাছ থেকে আড়াল করা? হয়ত তার থেকেও কিছু বেশি—শত্রুর কাছ থেকে তথ্য গোপন করাও ছিল কূটনীতিবিদদের একটা বড় উদ্দেশ্য

("The reason the treaties and agreements were almost always 'secret' was not to keep their own people in ignorance but to prevent too much useful information on war plans from being revealed to the enemy:—Hartmann)। এ কথা অবশ্য মনে রাখতে হবে যে গোপনীয়তা কূটনীতির অন্তর্নিহিত বিষয়। খোলা কূটনীতি সূচিত হওয়ার পরেও কূটনীতি যতখানি খোলা হওয়া উচিত ছিল ততখানি হতে পারেনি। হার্টম্যান (Hartmann) বলেছেন যে বস্তুতপক্ষে খোলা কূটনীতির পরবর্তী অধ্যায়েও কূটনীতি কখনোই সে অর্থে খোলা হতে পারেনি যে তার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত গোপন তথ্যই জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করে দেওয়া হত। যা হয়েছিল তা হল এই যে কূটনীতির প্রক্রিয়া অনেক বেশি জনগণের কাছে উন্মুক্ত হয়েছিল ("As a matter of fact, even in the subsequent period of open diplomacy, diplomacy was never open in the sense that all secrets were publicly revealed, but only in that the process of negotiation itself became more public"—Hartmann)।

খোলা কূটনীতির যে ধারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আত্মপ্রকাশ করেছিল তার সবচেয়ে বড় ইঙ্গিতবাহী অভিজ্ঞান হল লীগ অফ নেশনস বা জাতিসংঘের সনদ (League Covenant)। এই সনদের ১৮নং ধারায় বলা হয়েছিল যে, যে কোন লীগ সদস্যকৃত চুক্তি বা আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারকে তৎক্ষণাৎ নথিভুক্ত করতে হবে—লীগ চুক্তিপত্রের ভাষায় "Every treaty or international engagement... by any Member of the League" was to be registered "forthwith"। তার পরে লীগ সেক্রেটারির দপ্তর (secretariat) তা ছাপবে। কোন চুক্তি এইভাবে নথিভুক্ত না হলে তা গ্রাহ্য—আইনের ভাষায় binding—হবে না।

লীগ চুক্তিপত্রের এই ১৮নং ধারার ফল হয়েছিল এই যে ১৯১৯ সালের পর থেকে প্রায় সমস্ত চুক্তি একটা সাধারণ ও সরল বয়ানে লিখিত হত। তার ভেতরের জটিলতাগুলিকে পরে কূটনৈতিক নোট চালাচালি ও নানা লিখিত কথার আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে স্থির করা হত, আর সেগুলি প্রায় গোপনই থাকত। খোলা কূটনীতির উদযাপনে লীগ চুক্তিপত্রের ১৮নং ধারাকে যত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা শেষ পর্যন্ত ততখানি গুরুত্ব ধারণ করতে পেরেছিল কি না বলা কঠিন। এই ১৮নং ধারা প্রতিপালিত না হলে কোন চুক্তির অন্তর্নিহিত শক্তি কমে যেত এমন ভাবা সঙ্গত নয়। কারণ চুক্তি দুই বা একাধিক দেশের পারস্পরিক সম্পর্কের গ্রাহ্য বিষয়, তা সর্বজনীনভাবে গ্রাহ্য নাও হতে পারে। এই শর্ত প্রতিপালিত না হলে খুব বেশি যা হতে পারত তা হল এই যে বিশ্ব আদালত বা কোন সালিসি কর্তৃপক্ষের কাছে তা গ্রাহ্য হত না। এর দ্বারা চুক্তির অন্তর্নিহিত শক্তি বিনষ্ট হত না। অর্থাৎ খোলা কূটনীতিকে যতটা বাস্তব ও কার্যকরী মনে করা হত তা হয়ত শেষ পর্যন্ত তা ছিল না। তা যদি না হয়ে থাকে তবে খোলা কূটনীতিকে এত সমাদার করা হয় কেন? আসলে গোপন কূটনীতি থেকে খোলা কূটনীতিতে রূপান্তরের ফল যা হয়েছিল তা কূটনীতির অন্তর্নিহিত ভাবের মধ্যে ততটা প্রকাশ পায়নি। পেয়েছিল কূটনীতির প্রক্রিয়ার মধ্যে। হার্টম্যান (Hartmann) বলেছেন যে খোলা পদ্ধতি গ্রহণ করার ফলে কূটনীতির মধ্যে যে পরিবর্তন এল তা পাওয়া যাবে আলাপ-আলোচনার প্রক্রিয়ার মধ্যে, তাকে পাওয়া যাবে উইলসনীয় চতুর্দশ শর্তের (Fourteen Points) সেই শর্ত প্রতিপালনের মধ্যে যাতে বলা হয়েছে যে কূটনীতি অগ্রসর হবে মুক্তভাবে এবং জনগণের জ্ঞাতসারে ("The real changes in diplomacy that resulted from the adoption of 'open' methods were to be found in the negotiating process itself, in the attempt to implement the wilsonian principle of the Fourteen Points that diplomacy shall proceed always frankly and in the public view.")। হার্টম্যান আরও বলেছেন যে এই শর্ত

কূটনীতিকে অসার করে দিয়েছিল— This principle almost wrecked diplomacy on the shoals of impotence। আক্ষরিকভাবে দেখতে গেলে এই শর্তের অর্থ হল আলোপ-আলোচনাকে জনগণকে জ্ঞাতসারে করতে হবে এবং একবার জনগণের জ্ঞাতসারে করার অর্থই হল জাতীয় সম্মান তার দ্বারা জড়িত হয়ে পড়ল। ("Taken literally..., negotiation must then be public. And once negotiation became public, national prestige inevitably became involved"—Hartmann)। এই দিক থেকে দেখতে গেলে খোলা কূটনীতি বাহ্যত বেশ কার্যকরী হয়েছিল। অন্তত কূটনৈতিক দেওয়া নেওয়ার পেছনে জনগণের সতর্ক নজর যে জাগ্রত প্রহরীর মত কাজ করতে পারে এবং তার দ্বারা যে পৃথিবীর শান্তি রক্ষিত হতে পারে এই বোধকে কূটনীতির উন্মুক্ত হওয়ার তত্ত্বের মধ্যে মেনে নেওয়া হয়েছিল।

৪(খ).৬ খোলা কূটনীতি নিয়ে মর্গেনথোর মত

বিশিষ্ট রাষ্ট্রনীতিবিদ হানস জে. মার্গেনথো (Hans J. Morgenthau) তাঁর *Politics Among Nations : The Struggle for Power and Peace* গ্রন্থে লিখেছেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কূটনীতির অবক্ষয় হয়েছে। এই অবক্ষয়কে তিনি 'কূটনীতির পতন' বা The Decline of Diplomacy বলেছেন। তিনি লিখেছেন যে আজকাল কূটনীতি সেই উদ্দীপিত, উজ্জ্বল এবং সারাক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনা যা সে করত তিরিশ বছরের যুদ্ধের শেষ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা পর্যন্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই কূটনীতির পতন হতে শুরু করে ("Today diplomacy no longer performs the role, often spectacular and brilliant and always important, that it performed from the end of the Thirty Year's War to the begining of the First World War. The decline of diplomacy set in with the end of the First World War"—Morgenthau)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে কূটনীতি এমনভাবে তার শক্তি হারিয়েছিল যা আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ইতিহাসে বিরল ("Since the end of the Second World War, diplomacy has lost its vitality, and its functions have withered away to such an extent as is without precedent in the history of the modern state system"—Morgenthau)। এই অবক্ষয়ের পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ আছে বলে তিনি মনে করেন। একটি কারণ হল যোগাযোগ ব্যবস্তার অভূতপূর্ব উন্নতি যার ফলে কোন কূটনীতিবিদকে কূটনৈতিক কার্যাবলীর জন্য ছলা-কলা, নিঃসীম গোপনীয়তা এবং পরভূমে অরক্ষিত থাকার অনিশ্চয়তা ইত্যাদির দ্বারা আক্রান্ত হতে হয় না। তিনি নিমেষে টেলিফোনের মাধ্যমে স্বদেশের সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, প্রয়োজনে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উড়ে যেতে পারেন নিজের দেশে। এই যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক উন্নতিতে কূটনীতিবিদদের মানসিকতা ও কার্যাবলীর পরিবর্তন হয়েছে। এর সঙ্গে পরিবর্তন হয়েছে দেশে দেশে মানুষের মানসিকতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত কূটনৈতিক টেকনিকের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার ছিল তার গোপনীয়তা। বিশ্বযুদ্ধের পর মানুষ বুঝতে পেরেছে যে এই গোপনীয়তাই বিশ্বশান্তির সবচেয়ে বড় শত্রু। মর্গেনথো (Morgenthau) বলেছেন যে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা প্রথমে এই বিশ্বাসকে জাগিয়ে তুলেছিল যে কূটনৈতিক কার্যাবলীকে বাদ দেওয়া যায়। তারপরে এই ধারণা যুক্ত হল যে কূটনৈতিক কার্যাবলীকে বাদ দেওয়া উচিত কারণ তা কখনোই শান্তির স্বার্থে প্রযুক্ত হয় না, তা শুধু শান্তিকে বিপন্ন করে তোলে মাত্র ("To the technological ability to part with because they not only contribute nothing to the cause of peace, but actually endanger it"—Morgenthau)

এই বিশ্বাস সেই পরিবেশেই জন্ম নিয়েছিল যে পরিবেশে আত্মপ্রকাশ করেছিল এই বোধ যে ক্ষমতার রাজনীতি ইতিহাসের দুর্ঘটনা থাকে মনোবলের দ্বারা অপসারিত করতে হবে ("The conviction grew in the same soil that nourished the conception of power politics as an accident of history to be eliminated at will"—Morgenthau)।

এই বোধই কূটনীতির অবক্ষয়ের সবচেয়ে বড় কারণ। আর এই বোধের সবচেয়ে বড় প্রকাশ হল উড্রো উইলসনের (Woodrow Wilson) চতুর্দশ শর্তের (Fourteen Points) প্রারম্ভিক ঘোষণা (Preamble) : "এটাই হবে আমাদের ইচ্ছা আর উদ্দেশ্য যে শান্তির প্রক্রিয়া যখন শুরু হবে তখন তা হবে চূড়ান্তভাবে খোলা এবং এর পর থেকে এই প্রক্রিয়ার আর কোন গোপন বোঝাপড়া স্থান পাবে না ("It will be our wish and purpose that the processes of peace, when they are began, shall be absolutely open, and that they shall involve and permit henceforth no secret understandings of any kind"—Morgenthau)। এইরকম একটি সার্বিক ঘোষণা দিয়ে শুরু হয়েছিল খোলা কূটনীতির মুক্ত অঙ্গীকার। এইভাবে সনাতন কূটনীতি, গোপনীয়তা-ভিত্তিক ধ্রুপদী কূটনীতির (Classical diplomacy) অবক্ষয়ের অতলে তলিয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই নয়া কূটনীতির আবির্ভাব ঘটল এক মুক্তদ্বার রাজনীতির অভিজ্ঞান হিসাবে। তাঁর চতুর্দশ শর্তের (Fourteen Points) প্রারম্ভিক ঘোষণায় (Preamble) রাষ্ট্রপতি উইলসন আরও বললেন ঃ "রাজ্যবিজয় ও সম্প্রসারণের যুগ শেষ হয়ে গেছে; আর তার সাথে শেষ হয়ে গেছে গোপন ইস্তাহারের দিন যে ইস্তাহার স্বাক্ষর করা হত নির্দিষ্ট কিছু সরকারের স্বার্থে, এমন ইস্তাহার যা কোন অভাবিত মুহূর্তে পৃথিবীর শান্তি বিনষ্ট করে দিতে পারত" ("The day of conquest and aggrandizement is gone by; so is also the day of secret covenants entered into in the interest of particular governments, and likely at some unlooked for moment to upset the peace of the world"—Woodrow Wilson)। স্পষ্টতই উড্রো উইলসন একটি যুগের অবসানের কথা ঘোষণা করছেন, আর সে যুগ, মর্গেনথোর মতে সনাতন কূটনীতির যুগ। এইভাবে সনাতন কূটনীতির অবসানের মুহূর্তে নয়া কূটনীতির (New Diplomacy) জন্ম হল। রাষ্ট্রপতি উইলসন সেই প্রারম্ভিক ঘোষণায় বললেন ঃ "এই হচ্ছে সেই আনন্দ সংবাদ যা এখন সমস্ত গণমানবের কাছে পরিষ্কার—যে মানবের চিন্তাধারা মৃত এবং অপগত যুগের প্রতি নিবদ্ধ নয় যে চিন্তাধারা বিচার ও বিশ্বশান্তির প্রতি উদ্দিষ্ট যে কোন জাতিকে এখন বা ভবিষ্যতের কোন সময় সেই প্রতিশ্রুতিতে নিবেদিত হতে শেখায়" ("It is this happy fact, now clear to the view of every public man whose thoughts do not still linger in an age that is dead and gone, which makes it possible for every nation whose purposes are consistent with justice and the peace of the world to avow, now or at any other time, the objects it has in view"—Woodrow Wilson)।

মর্গেনথো রাষ্ট্রপতি উইলসনের এই মতটি উল্লেখ করে দেখাতে চেয়েছেন যে একটি অপসৃয়মান যুগের কূটনীতির মৃত্যুদলিলে স্বাক্ষর করেছিলেন বর্তমান যুগের এই সার্থক রাষ্ট্রশাসক, আর বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, যে খোলা কূটনীতির কথা আমরা বলি তা সনাতন কূটনীতির মৃত্যুকালীন এক নতুন উদ্ভাবনা যাকে তিনি বলেছেন "The modern version of that depreciation of diplomacy..."— "কূটনীতির সেই অবক্ষয়ের আধুনিক রূপায়ণ"। মনে রাখতে হবে যে হার্টম্যান কখনো নয়া কূটনীতিকে সনাতন কূটনীতির ধ্বংসের ওপর

গড়ে ওঠা মিনার হিসাবে দেখেননি। তাঁর মনে হয়েছিল রূপান্তরের ধারা বেয়ে সনাতন গড়িয়ে গেছে আধুনিকতায়, গোপন ইস্তাহারের যুগ ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই বিলীন হল আধুনিকতার প্রতিশ্রুতিময় মুক্তির বেলাভূমিতে। সেখানেও তাঁর সন্দেহ ছিল। মুক্তির যে প্রতিশ্রুতি খোলা কূটনীতির মধ্যে আরোপ করা হচ্ছে তা পরিণতিতে একটি পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পেরেছিল বলে তার মনে হয়নি। মর্গেনথো (Morgenthau) মনে করেন যে পুরানো কূটনীতির মধ্যে যে গোপনীয়তা ছিল তার অন্তর্নিহিত ভাবই ছিল মিথ্যাচার। তিনি লিখেছেন যে বিখ্যাত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার হেনরি ওটন (Sir Henry Wotton) সম্বন্ধে এই ধারণা পোষণ করা হত যে তিনি ছিলেন "একজন সৎ ব্যক্তি যাঁকে দেশের কারণে মিথ্যা কথা বলার জন্য বিদেশে পাঠানো হয়েছিল" ("an honest man sent abroad to lie for his country.")। ভিয়েনা কংগ্রেসের সময়ে যখন মেটারনিককে (Metternich) সংবাদ দেওয়া হল যে রুশ রাষ্ট্রদূত প্রয়াত হয়েছে তখন তিনি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলেন ঃ "আঃ, তা কি সত্যি? তাঁর [অর্থাৎ সেই রাষ্ট্রদূতের] উদ্দেশ্য কি হতে পারে?" ("Ah, is that true? What may have been his motive?")। কূটনীতির গোপনীয়তা ও চক্রান্ত প্রবণতা এমনি ছিল যে কোন কূটনীতিবিদের মৃত্যুর পরও প্রশ্ন ওঠে যে আলোচনা চলাকালীন তাঁর অকালমৃত্যুর পেছনে উদ্দেশ্য কি থাকতে পারে।

এইরকম চক্রান্ত আর সন্দেহে ঠাসা গোপনীয়তার যুগ শেষ হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। মর্গেনথো লিখলেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এবং পরে এই মতকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল যে কূটনীতিবিদদের গোপন ষড়যন্ত্র, বৃহৎ অংশের জন্য না হলেও, অনেকখানি সেই যুদ্ধের জন্য দায়ী ("During and after the First World War, wide currency was given to the opinion that the secret machinations of diplomats shared a great deal, if not the major portion, of responsibility for that war ..."—Morgenthau)। শুধু তাই নয় কূটনৈতিক আদান-প্রদানের গোপনীয়তার মধ্যে রয়েছে—মর্গেনথো বিশ্বাস করেন—অভিজাততান্ত্রিক অতীতের পূর্বপুরুষীয় ও বিপজ্জনক তলানি ("...that the secrecy of diplomatic negotiations was an atavistic and dangerous residue from the aristocratic past..."—Morgenthau)। এর সঙ্গে এই ধারণাও চালু হয়েছিল যে, যে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া শান্তিপ্রিয় গণমতের সতর্ক চোখের সামনে দিয়ে পরিচালিত ও পরিণতিপ্রাপ্ত তা শান্তির স্বার্থকে বৃদ্ধি না করে পারে না ("...that international negotiations carried on and concluded under the watchful eyes of a peace loving public opinion could not but further the cause of peace"—Morgenthau)।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, যে নয়া কূটনীতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ও পরে চালু হয়েছিল তা শান্তির স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য প্রচলিত হয়েছিল, তার উদযাপন হয়েছিল নবযুগের উদ্বোধিত গণমতের সতর্ক প্রহরায় এবং শেষ পর্যন্ত তা মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছিল সেই কূটনৈতিক অতীতের যার মধ্যে অভিজাততান্ত্রিক গোপনীয়তার পূর্বপুরুষীয় (atavistic) ধারা বহমান ছিল। অভিজাততান্ত্রিক গোপনীয়তার খোলসের বাইরে আসার পরেই নয়া কূটনীতির আবির্ভাব হয় যে কূটনীতির পশ্চাৎপ্রেক্ষায় একটি শক্তিশালী জনমতের আবির্ভাবকে লক্ষ্য করা যায়। রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে অভিজাততান্ত্রিক আদানপ্রদানের সঙ্গোপন প্রয়াস সনাতন কূটনীতির ব্যবহারিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাকে সম্পূর্ণ বাতিল করে দিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, আর ডাক দিল এক মুক্ত দুনিয়ার যেখানে শান্তির ললিত সাধনা প্রতিষ্ঠিত হল খোলা কূটনীতির অবারিত অঙ্গনে। মর্গেনথো

(Morgenthau) এই সমস্ত ব্যাপারটিকেই কূটনীতির সার্বিক অবক্ষয়ের এক অবিভাজ্য ধারা বলে মনে করেন। নয়া কূটনীতিকে, অর্থাৎ গোপন কূটনীতির স্থলে খোলা (Open) কূটনীতিকে, তিনি কূটনীতির আধুনিকতর পর্ব বলে মেনে নিলেও তাকে সনাতন কূটনীতির উন্নততর রূপান্তর বলে মনে করেননি।

৪(খ).৭ নয়া কূটনীতি কি বিদ্রোহ?

হ্যারোল্ড নিকোলসনের (Harold Nicolson) গবেষণা থেকে আমরা আগেই জানতে পেরেছি যে গোপনীয়তা ভিত্তিক কূটনীতি আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার দান, অর্থাৎ তা ঘনীভূত হয়েছিল জাতীয় রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পর থেকে। জাতীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ক্ষমতা লিপ্সা, বড় হওয়ার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বাজার ও উপনিবেশের জন্য লড়াই, স্থির সৈন্যবাহিনী (Standing army) মোতায়েন, আড়াল করা সম্পর্ক, গোপন আঁতাত, স্বার্থসিদ্ধির জন্য অনৈতিক চুক্তি ইত্যাদির কারণে গুপ্ত আলোচনা, গোপন কূটনীতি ইত্যাদির দরকার হত। যখন বিশ্বযুদ্ধে এ ধরনের কূটনীতির বীভৎস পরিণতি দেখে তাকে বর্জনের প্রশ্ন উঠল তখন শেষ পর্যন্ত তা হয়ে দাঁড়াল আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। মর্গেনথো (Morganthau) বলেছেন "কূটনীতির বিরুদ্ধাচরণ এবং তার অবক্ষয় তাহলে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং যে ধরনের আন্তর্জাতিক রাজনীতির জন্ম সে দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে এক বৈরিতার একটি বিশেষ প্রকাশমাত্র" ("The opposition to, and depreciation of, diplomacy is then but a peculiar manifestation of hostility to the modern state system and the kind of international politics it has produced"—Morgenthau)। আসলে নয়া কূটনীতি অতীতের অভিজাততান্ত্রিক কূটনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক বৈরিতাকে বহন করত বলেই এর মধ্যে একটা বিদ্রোহের ভাব রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় ঘটনা হল গণমতের উত্থান যা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার দান। এই গণমতই সনাতন কূটনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়েছিল। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই প্রতিবাদের ফলেই নয়া কূটনীতির আবির্ভাব বলে অনেকে এই নয়া কূটনীতিকে "গণতান্ত্রিক কূটনীতি" (Democratic Diplomacy) বলে অভিহিত করেছেন। বিখ্যাত দুই রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নর্ম্যান ডি. পামার এবং হাওয়ার্ড সি. পারকিনস তাঁদের ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস্ ঃ দ্য ওয়ার্ল্ড কমিউনিটি ইন ট্রান্জিশন (Norman D. Palmer and Howard C. Perkins : *International Relations : The World Community in Transition*) গ্রন্থে লিখেছেন যে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে 'গণতান্ত্রিক কূটনীতি' নামক শব্দটি সাধারণ ব্যবহারের মধ্যে চলে আসে। এটি বিশ্বব্যাপারে একটি নতুন ব্যবস্থার ইঙ্গিতবাহী ছিল—এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে বিভিন্ন সরকার দ্রুত তাদের অভিজাততান্ত্রিক ঝোঁক এবং বিচ্ছিন্নতাকে হারাচ্ছিল, যে ব্যবস্থায় এক দেশের জনগণ কথা বলছিল আরেক দেশের জনগণের সাথে আর তা বলছিল গণতান্ত্রিক প্রতিনিধি ও বেসরকারি মাধ্যমে ("By the early twentieth century the term 'democratic diplomacy' had come into common use. It seemed to symbolize a new order in world affairs—one in which governments were fast losing their aristocratic leanings and this aloofness, and peoples were speaking to peoples through democratic representatives and informal channels"—Palmer and Perkins) এখন কথা হল, গোপন কূটনীতির (Secret Diplomacy) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে যে 'গণতান্ত্রিক কূটনীতি'র আবির্ভাব হয়েছিল তা নয়া কূটনীতির ভাবকে প্রকাশ করলেও তা কি সার্থক হয়েছিল? পামার ও পার্কিনস-এর মতে তা হয়নি। আর এই না হওয়াটা হয়ত নয়া কূটনীতির ব্যর্থতা। এই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদ্বয় বলেছেন যে বস্তুতপক্ষে